কাসাসুল কুরআন-১

হযরত আদম আ.

হযরত নুহ আলাইহিস সালাম
হযরত ইদরিস আলাইহিস সালাম
হযরত হুদ আলাইহিস সালাম
হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

নবী-রাসুল সিরিজ-১

কাসাসুল কুরআন-১

হযরত আদম আলাইহিস সালাম
হযরত নুহ আলাইহিস সালাম
হযরত ইদরিস আলাইহিস সালাম
হযরত হুদ আলাইহিস সালাম
হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

কাসাসুল কুরআন-১

মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

সম্পাদনা
মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক
হাফেজ কুতুবুদ্দীন আহমাদ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ তকি হাসান

সার্বিক যোগাযোগ
মাকতাবাতুল ইসলাম
[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২
০১৯১১৬২০৪৪৭
০১৯১১৪২৫৬১৫

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ১৯০ [একশত নব্বই] টাকা মাত্র

QASASUL QURAN [1]
Writer : Mawlana Hifjur Rahman RH
Translated by : Abdus Sattar Aini
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 190.00
ISBN : 978-984-90976-5-5
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatulislam.net

লেখকের কথা

الحمد لله الذى هدانا بالكتاب المبين، و أنزل علينا القرأن بلسان عربى مبين، و قص فيه أحسن القصص موعظة و ذكرى للمتقين، والصلاة والسلام على النبى الصادق الأمين - محمد رسول الله و خاتم النبين - و على آله و وأصحابه الذين هم هداة للمتقين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সুস্পষ্ট কিতাবের মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং আমাদের ওপর কুরআনকে স্পষ্ট আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন এবং মুত্তাকি মানুষদের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাতে সুন্দরতম ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নবী—আল্লাহর রাসুল ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর; এবং তার পরিবার ও সঙ্গীবর্গের ওপর, যাঁরা ছিলেন আল্লাহভীরু মানুষদের পথপ্রদর্শক।

তারপর কথা এই যে, কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা মানবজগতের হেদায়েতের জন্য যে-বিভিন্ন অলৌকিক বর্ণনাশৈলী অবলম্বন করেছেন, তার মধ্যে একটি এই যে, অতীতকালের জাতি ও সম্প্রদায়ের ঘটনাবলি ও কাহিনিসমূহ বর্ণনা করার মাধ্যমে তাদের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম এবং সেসব কর্মের প্রতিদান ও পরিণাম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ পেশ করেছেন। এ-কারণেই কুরআন ইতিহাসভিত্তিক বর্ণনাশৈলী অবলম্বন করে নি; বরং সত্যের প্রচার ও আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের যে-গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য তার প্রেক্ষিতে কেবল সেসব ঘটনাকেই সামনে উপস্থিত করেছেন যা সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণাঙ্গ করতে পারে। এ-কারণে কুরআনুল কারিমে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় যাতে ঘটনাগুলোকে শ্রোতাদের অন্তরে বদ্ধমূল করা যায় এবং তাদের প্রাকৃতিক ও স্বভাবগত প্রবণতাকে সেসব সত্যের প্রতি অভিমুখী করা যায়। আর এটি তখনই সম্ভব হতে পারে যখন একটি ঘটনাকে স্থান ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনাশৈলীতে বার বার

উল্লেখ করা হয় এবং তার দ্বারা মানুষের সুপ্ত চিন্তাশক্তিকে সজাগ ও বিকশিত করা হয়।

কুরআনুল কারিমে বর্ণিত কাহিনিসমূহ ও ঘটনাবলির অধিকাংশই প্রাচীনকালের জাতি ও সম্প্রদায় এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবী ও রাসুল-সম্পর্কিত। আবার প্রসঙ্গক্রমে অন্য কয়েকটি ঘটনার আলোচনাও এসেছে। এই যাবতীয় ঘটনা সত্য ও মিথ্যার সংগ্রাম, আল্লাহর বন্ধু এবং শয়তানের দোসরদের মধ্যকার লড়াইয়ের কাহিনি-সম্বলিত শিক্ষা গ্রহণের ও উপদেশ লাভের এক অতুলনীয় ভাণ্ডার।

কিন্তু অন্য লোকদের কথা আর কী বলবো, আমাদের মুসলমানদের মধ্যেই খুব কম লোকই আছেন যাঁরা আল্লাহ তাআলার এই পূর্ণাঙ্গতম ও সর্বশেষ জীবনবিধান (কুরআনুল কারিম) থেকে উপকার (শিক্ষা ও উপদেশ) লাভ করেন এবং নিজেদের মৃত অন্তরসমূহে ঈমান ও বিশ্বাসের সজীবতা সৃষ্টি করেন,—এ-কারণে যে, তা আল্লাহ তাআলার বিধান এবং তা মেনে চলতে আমরা আদিষ্ট—এবং তার অর্থ ও উদ্দেশ্যের ওপর চিন্তা-ভাবনা করেন এই ভেবে যে, তা পৃথিবীর অস্তিত্ব যতদিন আছে ততদিন পর্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও চিরন্তন জীবনের, ইহকাল ও পরকালের সফলতা ও সৌভাগ্যের পূর্ণাঙ্গ বিধান।

কুরআনুল কারিম নাযিল হওয়ার সময় আল্লাহ তাআলার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের শত্রুতামূলক আচরণে বিরক্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করেছিলেন—

يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

"হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।"[১]

কিন্তু এই চতুর্দশ শতাব্দীতে যদি আমরা আমাদের অন্তরসমূহের অবস্থা যাচাই করে দেখি, তবে মুসলমান হওয়ার দাবি এবং কুরআনকে আল্লাহর কালাম বিশ্বাস করা সত্ত্বেও (দেখবো যে,) কী পরিমাণ লোক আল্লাহ তাআলার কালামকে তাঁদের জীবনের জন্য সর্বোত্তম কর্মপদ্ধতি বানিয়েছেন এবং এই লক্ষ্যে তা তেলাওয়াত করছেন।

[১] সুরা ফুরকান : আয়াত ৩০।

নিজের ও নিজের জাতির এই অবস্থার প্রতি লক্ষ করে মন চাইলো যে, শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের ভাণ্ডার (কুরআনুল কারিম)-কে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে দিই যাতে অনূদিত বিষয় হৃদয়াঙ্গম করার পর আপনা-আপনিই মূল বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং এভাবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের সৌভাগ্য ও সফলতার সন্ধান মেলে।

নিজের সাদাসিধে দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও ঘটনাগুলোর মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে :

১। এই কিতাবে (কাসাসুল কুরআনে) কুরআনকেই সমস্ত ঘটনার ভিত্তি ও বুনিয়াদ বানানো হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদিস ও ইতিহাসের ঘটনাবলির আলোকে সেগুলো ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২। ইতিহাস ও বাইবেলের পুস্তকসমূহের মধ্যে এবং কুরআনুল কারিম থেকে লব্ধ 'দৃঢ় বিশ্বাস'-এর মধ্যে যদি বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, তবে হয়তো দলিল ও প্রমাণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে নয়তো কুরআনুল কারিমের সত্যতাকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করা হয়েছে।

৩। ইসরাইলি কল্পকাহিনি এবং বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগসমূহের অসারতাকে সত্যের আলোকে প্রকাশ করা হয়েছে।

৪। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাফসিরমূলক, হাদিসমূলক ও ঐতিহাসিক সন্দেহ ও জটিলতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মতাদর্শ অনুসারে তার সমাধান পেশ করা হয়েছে।

৫। প্রত্যেক নবীর অবস্থা কুরআনের কোন কোন সুরায় বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোকে একটি নকশার আকারে এক জায়গায় দেখানো হয়েছে।

৬। এসব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে 'উপদেশ ও শিক্ষা' শিরোনামে ঘটনাটি বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য ও আসল লক্ষ্য, অর্থাৎ শিক্ষা ও উপদেশের বিষয়টিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

খাদেমে মিল্লাত
মুহাম্মদ হিফযুর রহমান সেওহারবি
২২ শে রজব, ১৩৬০ হিজরি

সূচি

হযরত আদম আলাইহিস সালাম

প্রথম মানব

পবিত্র কুরআন হযরত আদম আ.-সম্পর্কিত যেসব তথ্য বর্ণনা করেছে সেগুলোর বিস্তারিত উল্লেখের আগে এটা পরিষ্কার হওয়া জরুরি যে অস্তিত্বের জগতে মানুষের আগমন-সম্পর্কিত আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে। এটি ارتقاء (Evolution) বা ক্রমবিকাশ/ক্রমবিবর্তন নামে অভিহিত। ক্রমবিবর্তনবাদের দাবি হলো, বিদ্যমান মানবজাতি তাদের আদি সৃষ্টিকাল থেকে মানবরূপে সৃষ্টি হয় নি; বরং এই অস্তিত্বের জগতে সে বহু স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান মানবাকৃতিতে উন্নীত হয়েছে। এর কারণ এই যে, বিজ্ঞানীদের মতে প্রাণীজগৎ প্রথমে নির্জীব পদার্থ এবং পরে উদ্ভিদ জাতীয় বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে উন্নতি করতে করতে প্রথমে জোঁকের রূপ ধারণ করে। তারপর এভাবে বহু যুগ পরে প্রাণী জাতীয় ছোট-বড় বিভিন্ন শ্রেণির প্রাণীর রূপ ধারণ করতে করতে অবশেষে মানুষের আকৃতিতে স্থিতিলাভ করেছে।

এ-সম্পর্কিত ধর্মের বক্তব্য এই যে, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা আদি মানবকে আদম আ.-এর আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। তারপর তারই অনুরূপ তার স্বাজাতি হযরত হাওয়া আ.-কে অস্তিত্বে এনেছেন এবং ধারাবাহিকভাবে মানবজাতির বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। আর আদম সন্তানই সেই মানুষ বিশ্বনিখিলের স্রষ্টা যাকে সমস্ত সৃষ্টির ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আসমানি শরিয়তের গুরুভার আমানত তার ওপর সোপর্দ করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহপাক মানুষকে তার প্রতিনিধিত্বের মাহাত্ম্য দান করেছেন। এ-সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (سورة التين)

'নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি।' [সূরা তীন : আয়াত ৪]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (سورة بني إسرائيل)

'আর নিঃসন্দেহে আমি আদম সন্তানদেরকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে আমি উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর আমি তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' [সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৭০]

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (سورة البقرة)

'আমি পৃথিবীতে [আদমকে] আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।' [সূরা বাকারা : আয়াত ৩০]

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (سورة الأحزاب)

'আমি তো আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তা বহন করতে শঙ্কিত হলো; কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করলো।' [সূরা আহযাব : আয়াত ৭২]

এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, ক্রমবিবর্তন (Evolution) মতবাদ এবং ধর্মীয় মতের মধ্যে এই বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানগত বিরোধ বিদ্যমান না-কি এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানেরও কোনো সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে যখন বিবেক ও বোধ এবং অভিজ্ঞতা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ধর্মের নির্দেশিত তথ্য এবং বিবেক ও বোধের মধ্যে কোনো স্থানে বিরোধ নেই। বাহ্যত কোনো কোনো স্থানে যদি এ-ধরনের বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে যে বিবেকসম্মত কোনো কোনো তথ্য গোপনীয় থাকার কারণেই এমন মনে হচ্ছে। কেননা বারবার এটা দেখা গেছে যে বিবেক ও বুদ্ধিগত কোনো গোপনীয় তথ্য যখনই মানব-বিবেকের সামনে উন্মোচিত হয়েছে তখন ওই বিরোধ দূরীভূত হয়েছে এবং সেই তথ্যই বিবেক ও বুদ্ধির সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে যা মহান আল্লাহপাকের ওহির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিলো।

অন্য কথায় বিষয়টি এভাবে বলা যায়, বিবেক ও বুদ্ধির এবং ধর্মের মধ্যে যে-কোনো সময় বিরোধ দেখা দিলে বিবেককে নিজের স্থান ত্যাগ করতে হয় এবং আল্লাহপাকের ওহির মীমাংসাই সুদৃঢ় থাকে।

তাই এই ক্ষেত্রেও আপনাআপনিই এই প্রশ্ন সামনে এসে যায় যে এই বিশেষ আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ 'ক্রমবিবর্তন'-এর ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা কী এবং তা কেমন?

এ-জিজ্ঞাসার উত্তরেও বলা যায় যে, আলোচ্য বিষয়ে বুদ্ধিগত মতবাদ ক্রমবিবর্তন এবং ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অবশ্য বিষয়টি সূক্ষ্মদর্শিতার মুখাপেক্ষী; তাই এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই। এ-গ্রন্থেরই অন্য জায়গায় বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

তারপরও এখানে এই তথ্যটি অবশ্যই সামনে থাকা জরুরি যে আদিমানব বা প্রথম মানব (যিনি বর্তমান মানবজাতির আদিপিতা হযরত আদম আ.) ক্রমবিবর্তন-মতবাদ অনুসারে ধাপে ধাপে উন্নতি সাধন করে মানুষের আকৃতি পর্যন্ত পৌঁছে থাকুক বা প্রথম সৃষ্টিকাল থেকেই মানবাকৃতিতে অস্তিত্ব লাভ করে থাকুক, বিবেক ও বুদ্ধি এবং ধর্ম উভয়ই এ-বিষয়ে একমত যে বর্তমান কালের এই মানবজাতিই যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে সেরা এবং জ্ঞান-বুদ্ধিবিশিষ্ট এই আকৃতিকেই নিজের ভালো-মন্দ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে এবং তারাই আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত বিধি-বিধানের ভারার্পিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত।

অথবা এভাবে বলা যেতে পারে যে, মানুষের জ্ঞান ও কার্যকলাপ এবং চারিত্রিক কর্মকাণ্ড ও গতিবিধির পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথার কোনো গুরুত্ব নেই যে তার সৃষ্টি ও অস্তিত্বলাভ এবং প্রাণীজগতে আসার বিশদ বিবরণ কী। বরং গুরুত্বের বিষয় হলো, এই সৃষ্টিজগতে তার অস্তিত্ব এমনি নিরর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই আকার লাভ করেছে না-কি তার অস্তিত্ব নিজের মধ্যে কোনো মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে? তার কার্যকলাপ ও বক্তব্যসমূহ এবং চারিত্রিক গুণাবলি ও চালচলনের ফলাফল কি একেবারেই লক্ষ্যহীন? তার জড়দেহের ও আধ্যাত্মিক মর্যাদাসমূহ সবই নিরর্থক ও নিষ্ফল না-কি মূল্যবান প্রতিফলের অধিকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ? আর তার জীবন কি নিজের মধ্যে কোনো উজ্জ্বল ও আলোকদীপ্ত তত্ত্ব বহন করছে না কোনো অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের বার্তা বহন করছে? না-কি তার অতীত ও বর্তমান তাদের ভবিষ্যৎ থেকে বঞ্চিত?

এসব তত্ত্ব ও বাস্তবতার উত্তর যদি নেতিবাচক না হয়; বরং ইতিবাচক হয়, তাহলে স্বতঃসিদ্ধভাবে এ-কথা মেনে নিতে হবে যে মানবের সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার পরিবর্তে অস্তিত্বের জগতে তার আগমনের লক্ষ্যের প্রতি পুরো দৃষ্টি ও মনোযোগ দেয়া হোক এবং এ-কথা মেনে নেয়া হোক যে এই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভের পেছনে নিঃসন্দেহে এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে।

এ-কারণেই পবিত্র কুরআন মাজিদ মানবজাতি-সংক্রান্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচর উভয় দিকের পরিষ্কার বর্ণনা দিয়ে মানবজাতির অস্তিত্বের মহত্ত্ব ঘোষণা করেছে এবং বলেছে যে সমুদয় সৃষ্টির স্রষ্টার উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশক্তির মধ্যে মানব-সৃষ্টি সর্বোত্তম গঠনের মর্যাদা রাখে। এ-কারণেই মানুষ যাবতীয় সৃষ্টির তুলনায় অধিক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আর নিঃসন্দেহে সে নিজের সুন্দরগঠন ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান হওয়ার যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহপাকের সেই আমানতের ভার বহনকারী হয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধির পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকারী। আর যখন তার মধ্যে এসবকিছু নিহিত রয়েছে, তাহলে তার অস্তিত্বকে এমনি লক্ষ্যহীন নিষ্ফলরূপে পরিহার করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এ-ব্যাপারে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন—

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (سورة القيامة)

'মানুষ কি ভেবেছে যে তাদেরকে এমনি-এমনি (উদ্দেশ্যবিহীনভাবে) ছেড়ে দেয়া হবে?' [সুরা কিয়ামাহ : আয়াত ৩৬]

আর এটা জরুরি যে, বিবেক ও বুদ্ধিবিশিষ্ট এই আকৃতিকে গোটা সৃষ্টিজগতের সেরা বানিয়ে তাকে ভালো-মন্দের পার্থক্যকরণের শক্তি প্রদান করা এবং মন্দ থেকে দূরে থাকা ও ভালোকে অবলম্বন করার বিধি-বিধানের ভারার্পিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত বানানো। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

'তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, তারপর পথনির্দেশ করেছেন।' [সুরা ত্বোয়া-হা : আয়াত ৫০]

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

'আর আমি তাকে দুটি পথ দেখিয়েছি।' [সুরা বালাদ: আয়াত ১০]

সারকথা, এই অস্তিত্বই—যাকে মানুষ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনের উপদেশ ও আহ্বান, নির্দেশাবলি ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ, পথনির্দেশ ও হেদায়েতের লক্ষ্যস্থল এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কেন্দ্রস্থল। আর এ-কারণেই পবিত্র কুরআন আদিমানবের সৃষ্টির অবস্থা

ও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান না করে তার দুনিয়া ও আখেরাতের বিধি-বিধানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

আদম আ.-এর উল্লেখ-সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহ

পবিত্র কুরআনে হযরত আদম আ.-এর নাম পঁচিশটি আয়াতে পঁচিশ বার এসেছে। নিচে প্রদর্শিত ছকে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা	সূরার নাম	আয়াত	আয়াত-সংখ্যা
২	سورة البقرة	২১, ২৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭	৫
৩	سورة آل عمران	২৩, ৫৯	২
৫	سورة المائدة	২৭	১
৭	سورة الأعراف	১১, ১৯, ২৬, ২৭, ৩১, ৩৫, ১৭২	৭
১৭	سورة الإسراء	৬১, ৭০	২
১৮	سورة الكهف	৫০	১
১৯	سورة مريم	৫৮	১
২০	سورة طه	১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২১	৫
৩৬	سورة يس	৬০	১

পবিত্র কুরআনে নবীদের আলোচনাসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম আদম আ.-এর আলোচনা করা হয়েছে এবং তা নিম্নলিখিত সূরাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে : সূরা বাকারা, সূরা আ'রাফ, সূরা ইসরা (বনি ইসরাইল), সূরা কাহফ এবং সূরা তোয়া-হা-য় আদম আ.-এর নাম, গুণাবলি ও কার্যাবলির আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা হিজর ও সূরা সোয়াদে শুধু গুণাবলি এবং সূরা আলে-ইমরান, সূরা মায়েদা, সূরা মারইয়াম এবং সূরা ইয়াসিনে আনুষঙ্গিক হিসেবে শুধু নামের উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত সূরা ও আয়াতসমূহে হযরত আদমের প্রসিদ্ধ ঘটনাটি যদিও বর্ণনারীতি, প্রকাশভঙ্গি ও সূক্ষ্ম বিবৃতি হিসেবে বিভিন্নরূপে পরিলক্ষিত

হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য এবং ঘটনা হিসেবে একই বস্তু, যা উপদেশ ও নসিহতের উদ্দেশ্যে যথাস্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে শুধু ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করে না, যে-ঘটনাগুলো ইতিহাসের ধারায় সন্নিহিত হওয়া আবশ্যক; বরং কুরআনপাকের একমাত্র উদ্দেশ্য—এসব ঘটনা থেকে নিষিক্ত ফল ও পরিণতিকে হেদায়েত ও সুপথ লাভের উপদেশ ও উপকরণ হিসেবে পেশ করা এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের কাছে এই নিবেদন করা যে, সে যেনো প্রকৃতি স্বাভাবিক নিয়ম-কানুনের ছাঁচে ঢালা এসব ঐতিহাসিক ঘটনার ফল ও পরিণতি থেকে শিক্ষা লাভ করে, ঈমান আনে এবং বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। আর তাঁর অসীম কুদরতের হাতই বিশ্বজগতের যাবতীয় অস্তিত্বের ওপর কাজ করছে। আর সেসব ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলাতেই সফলতা ও মুক্তি এবং যাবতীয় উন্নতির রহস্য নিহিত রয়েছে। এর নামই সৃষ্টিগত ধর্ম বা ইসলাম।

পবিত্র কুরআনের এটাও একটা অলৌকিক ক্ষমতা যে তা একই ঘটনাকে বিভিন্ন সুরায় তাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন অভিনব পদ্ধতিতে বর্ণনা করা সত্ত্বেও মৌলিকতায় ও দৃঢ়তায় সামান্যতম ভিন্নতাও আসতে দেয় নি। কোথাও ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আছে, কোথাও রয়েছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, কোনো স্থানে তার একটি দিকের বর্ণনা ছেড়ে দেয়া হলে অন্য জায়গায় সেই দিকটিকেই আরো উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এক স্থানে সেই ঘটনা থেকে আনন্দ ও প্রফুল্লতা এবং আস্বাদ ও সজীবতা সঞ্চারকারী ফল ও পরিণতি সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য জায়গায় সেই ঘটনার সামান্য পরিবর্তন ছাড়াই ভয় ও আতঙ্কের ছবি অঙ্কন করা হয়েছে। বরং কোনো কোনো সময় সুখাস্বাদন ও দুঃখানুভব উভয় বিষয় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উপদেশ ও নসিহতের এসব ভাণ্ডারের মধ্যেও মূল ঘটনার মৌলিকতায় ও দৃঢ়তায় সামান্য পরিবর্তন ঘটাও অসম্ভব।

কোনো সন্দেহ নেই, এটা আল্লাহপাকের কালামেরই শান ও বৈশিষ্ট্য এবং পবিত্র কুরআনের অলৌকিক শক্তি এবং তা বিপরীতধর্মী গুণাবলির অধিকারী মানবমণ্ডলীর ভাষিক অলঙ্কার ও বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ সাবলীলতারও ঊর্ধ্বে। এ-বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

'তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে না? তা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেতো।' [সূরা নিসা : আয়াত ৮২]

আদম-সৃষ্টি, ফেরেশতাদের প্রতি সিজদার আদেশ, শয়তানের অস্বীকৃতি

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম সা.-কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'খামিরা' প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ ফেরেশতাদের জানালেন যে, অচিরেই তিনি মাটি দিয়ে একটি মাখলুক সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন। সেই মাখলুককে 'বাশার' (মানুষ) বলা হবে এবং জমিনে সে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্বের সম্মান লাভ করবে।

আদম আ.-এর খামির মাটি থেকে প্রস্তুত করা হয়েছিলো এবং এমন মাটি থেকে প্রস্তুত করা হয়েছিলো, যা ছিলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। খামির-মাটি দিয়ে সৃষ্ট আদমের দেহাবয়ব শুকিয়ে মাটির পাত্রের খণ্ডের মতো হয়ে গেলো এবং তাতে আঘাত করলে খনখন শব্দ হতে লাগলো। আল্লাহ তাআলা এই মাটি-নির্মিত দেহাবয়বের ভেতরে 'রুহ' ফুঁকে দিলেন এবং সঙ্গেই সঙ্গেই তা মাংস, চর্ম, হাড়, রগ, শিরা-উপশিরাবিশিষ্ট জীবন্ত মানুষ হয়ে গেলো এবং অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিক্ষালাভের প্রেরণা ও অবস্থার অধিকারীরূপে দৃষ্ট হতে লাগলো। তখন ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ জারি হলো—তোমরা এর প্রতি সিজদাবনত হও। সঙ্গে সঙ্গেই ফেরেশতারা সকলেই আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করলেন। কিন্তু ইবলিস (শয়তান) গর্ব ও দম্ভের সঙ্গে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলো। পবিত্র কুরআন মাজিদ নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহে আদমের সৃষ্টি সংক্রান্ত ঘটনার এই অংশটুকু বর্ণনা করেছে—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ () وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (سورة البقرة)

'আর (দেখুন,) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, "আদমকে সিজদা করো", তখন (সঙ্গে সঙ্গে) ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো; সে নির্দেশ অমান্য করলো এবং অহংকার করলো। (সিজদার জন্য ইবলিসের

ঘাড় নত হলো না।) সুতরাং সে কাফেরদের দুলভুক্ত হলো। এবং (এই ঘটলো যে) আমি আদমকে বললাম, "হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার করো, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; (নিকটবর্তী) হলে (তার ফল এই দাঁড়াবে যে) তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"' [সূরা বাকারা : আয়াত ৩৪-৩৫]

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (سورة الأعراف)

'আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করি (তোমাদের অস্তিত্বে নিয়ে আসি এবং এটাই আমার কাজ), তারপর তোমাদের (মানবজাতির) আকৃতি দান করি এবং তারপর (সেই সময় এলো যে আমি) ফেরেশতাদেরকে আদমকে সিজদা করতে বলি; ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। (সে আমার আদেশ মানলো না।) সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।' [সূরা আ'রাফ : আয়াত ১১]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ () وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ () وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ () فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ () فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ () إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ

'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠনঠনা মৃত্তিকা (শুষ্ক হয়ে খনখন শব্দে বাজে এমন খামিরাবিশিষ্ট গারা মাটি) থেকে এবং তার আগে সৃষ্টি করেছি জিন অত্যুষ্ণ অগ্নি থেকে। স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বললেন, "আমি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠনঠনা মৃত্তিকা থেকে মানুষ (মানবজাতি) সৃষ্টি করছি; যখন আমি তাকে (তার দেহাবয়বকে) সুঠাম করবো (সারকথা, তার অস্তিত্ব পূর্ণতায় পৌঁছে যাবে) এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রুহ[২] (প্রাণ) সঞ্চার করবো তখন তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।" তখন ফেরেশতাগণ সকলেই

---

[২] রুহ অর্থ আত্মা ও আদেশ। জীবের ক্ষেত্রে এর অর্থ আত্মা এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে এর অর্থ আদেশ; যেমন : روح الله অর্থ আল্লাহর আদেশ।

একত্রে সিজদা করলো, ইবলিস ব্যতীত, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।' [সূরা হিজর : আয়াত ২৬-৩১]

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

'এবং স্মরণ করো, (যখন এমন ঘটেছিলো যে) আমি যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম, "আদমের প্রতি সিজদা করো", তখন তারা সবাই সিজদা করলো ইবলিস ব্যতীত; সে জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে (অর্থাঃ তোমাদের প্রতিপালককে ছেড়ে দিয়ে) তাকে (ইবলিস) এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছো? তারা তো তোমাদের শত্রু। (দেখো) জালিমদের এই বিনিময়[৩] কত নিকৃষ্ট!' [সূরা কাহ্ফ : আয়াত ৫০]

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ () فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ () فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ () إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (سورة ص)

'স্মরণ করো (সেই সময়, যখন), তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, "আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কর্দম থেকে, যখন আমি তাকে সুষম করবো এবং তাতে আমার রুহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।" তখন ফেরেশতারা সবাই সিজদাবনত হলো—কেবল ইবলিস ব্যতীত, সে অহংকার করলো এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।' [সূরা সোয়াদ : আয়াত ৭১-৭৪]

সিজদা অস্বীকার করার ওপর ইবলিসের বিতর্ক

আল্লাহ তাআলা যদিও অদৃশ্যের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত এবং মনের গোপনীয় ভাবনা ও কথাসমূহও অবগত আছেন এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর কাছে সমান; কিন্তু আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করার জন্য ইবলিস শয়তানকে প্রশ্ন করলেন—

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (سورة الأعراف)

---

[৩] অর্থাৎ আল্লাহকে পরিত্যাগ করে ইবলিস ও তার অনুসারীকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা।

তিনি বললেন, "স্বয়ং আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করলো যে তুমি সিজদা করলে না।"' [সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২]

আল্লাহর জিজ্ঞাসার জবাবে ইবলিস বললো—

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (سورة الأعراف)

"(এই বিষয়টি আমাকে সিজদা করতে বারণ করলো যে) আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা দিয়ে।" [সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২]

এতে শয়তানের উদ্দেশ্য ছিলো যে "আমি আদমের চেয়ে অধিক সম্মানিত।" কারণ আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আগুন উর্ধ্বগামী আর আদম মাটি দ্বারা নির্মিত। আগুনের সঙ্গে মাটির কোনো তুলনাই হতে পারে না। হে আল্লাহ, আপনি যে আদেশ করলেন— আগুন দ্বারা সৃষ্ট মাখলুক মাটি দ্বারা সৃষ্ট মাখলুককে সিজদা করুক; এটা কি ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক হয়েছে? আমি সবসময়ই আদম থেকে উত্তম। সুতরাং সে আমাকে সিজদা করুক। আমি তো তার সামনে মাথা নত করবো না।

কিন্তু হতভাগা শয়তান তার গর্ব, অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে এ-কথা ভুলে গিয়েছিলো যে, যখন সে নিজে ও আদম উভয়ে আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট, তখন সৃষ্ট জীবের মূল তত্ত্ব স্রষ্টার চেয়ে বেশি স্বয়ং সৃষ্ট জীবও জানতে পারে না। শয়তান নিজের আত্মম্ভরিতা ও দম্ভের কারণে এ-কথাটি বুঝতে অক্ষম রয়ে গেলো যে মর্যাদার উচ্চতা ও নিম্নতা সেই পদার্থের ভিত্তিতে নয় যার মাধ্যমে কোনো সৃষ্ট জীবের খামিরা প্রস্তুত করা হয়েছে; বরং মর্যাদার ভিত্তি সেসব গুণাবলির ওপর নির্ভরশীল যা যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা সেই জীবের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন।

যাইহোক, শয়তানের জবাব ছিলো প্রবঞ্চনা ও অহংকারের মূর্খতার ভিত্তিতে স্থাপতি, এ-কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, মূর্খতাজনিত গর্ব ও আত্মম্ভরিতা তোমাকে এতোটাই অন্ধ করে দিয়েছে যে তুমি নিজের স্রষ্টার অধিকারসমূহ এবং তাঁর মর্যাদও ভুলে গেছো। এ-জন্য তুমি আমাকে অন্যায় আচরণকারী সাব্যস্ত করেছো এবং এ-বিষয়টি বুঝতে পারো নি যে তোমার অজ্ঞতা তোমাকে প্রকৃত সত্য হৃদয়াঙ্গম করতে অক্ষম ও অপারগ বানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তুমি এখন

তোমার অবাধ্যাচরণের জন্য চিরস্থায়ী ধ্বংসের উপযুক্ত হয়েছো এবং এটাই তোমার কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিদান।

ইবলিসের অবকাশ প্রার্থনা

ইবলিস যখন দেখলো যে বিশ্বনিখিলের স্রষ্টার নির্দেশ অমান্য করা, গর্ব, দম্ভ ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করা এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি অন্যায় আচরণের দোষারোপ করা ইত্যাদি অপরাধ তাকে রাব্বুল আলামিনের রহমতের দরবার থেকে বিতাড়িত করেছে এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে, তখন সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে তওবা করার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার কাছে এই দাবি জানালো যে—কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন; এই দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার আয়ুর রশি লম্বা করে দিন।

মহান আল্লাহর হেকমতের চাহিদাও ছিলো এটাই। তাই তিনি ইবলিসের দাবি মঞ্জুর করলেন। এটা শুনে তখন আবার সে একবার তার শয়তানি স্বভাব প্রকাশ করলো। বলতে লাগলো—আপনি যখন আমাকে আপনার দরবার থেকে বিতাড়িত করেই দিলেন, তো যে-আদমের কারণে আমার কপালে এই অপমান ও লাঞ্ছনা জুটেছে, আমিও আদমের সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করবো এবং তাদের পেছনে, সামনে, আশপাশে ও চারদিকে থেকে তাদেরকে বিপথগামী করবো। তাদের অধিকাংশকে আমি নাফরমান ও অকৃতজ্ঞ বানিয়ে ছাড়বো। তবে আপনার খাঁটি বান্দাগণ আমার আমার বিপথগামী করার তীরে ঘায়েল হবে না এবং তারা সবসময়ই সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বললেন, তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই। আমার সৃষ্টির বিধান—কর্মের বিনিময় ও কর্মের প্রতিফল—সুদৃঢ় বিধান। যে যেমন কার্যকলাপ করবে সে তেমনই ফল ভোগ করবে। আর যে-আদমসন্তান আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সে তোমারই সঙ্গে আল্লাহর শাস্তি জাহান্নামের উপযুক্ত হবে। যাও, নিজের দুর্ভাগ্য, অপমান ও লাঞ্ছনা নিয়ে এখান থেকে দূর হয়ে যাও এবং নিজের ও নিজের অনুসারীদের জন্য চিরস্থায়ী অভিশাপ জাহান্নামের অপেক্ষায় থাকো।

কুরআন মাজিদের নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলো উপরিউক্ত বিশদ বিবরণের ওপর আলোকপাত করছে—

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ () قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ () قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ () قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ () قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ () ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ () قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (سورة الأعراف)

'তিনি বললেন, "আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করলো যে তুমি সিজদা করলে না।" সে বললো, (এই বিষয়টি আমাকে সিজদা করতে বারণ করলো যে) "আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছো আর তাকে সৃষ্টি করেছো কাদা দিয়ে।" তিনি বললেন, "এই স্থান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। (জান্নাতে থেকে অহংকার করার অধিকার তোমার নেই।) সুতরাং (এখান থেকে তুমি) বের হয়ে যাও, তুমি নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।" সে বললো, "পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত (যখন মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করে উঠানো হবে সেই সময় পর্যন্ত) আমাকে অবকাশ দাও।" তিনি বললেন, "যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।" (তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো।) সে বললো, "তুমি আমাকে শাস্তিদান করলে, (তুমি যেহেতু আমার রাস্তা বন্ধ করে দিলে) এইজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষদের জন্য নিশ্চয় ওঁত পেতে থাকবো। তারপর আমি তাদের কাছে আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে (সারকথা, প্রত্যেক দিক থেকে) এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ (তোমার নেয়ামতের শোকর আদায়কারী) পাবে না।" তিনি বললেন, "তুই এই স্থান থেকে ধিক্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যা। মানুষের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবোই।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১২-১৮]

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ () قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ () قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ () وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ () قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ () قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ () إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ () قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ () إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ () قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ () إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ () وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (سورة الحجر)

'আল্লাহ বললেন, "হে ইবলিস, তোমার কী হলো যে তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?" (তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সিজদা করলে না?) সে বললো, (এটা আমার জন্য সম্ভব নয় যে) "আপনি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠনঠনা মৃত্তিকা (শুষ্ক হয়ে খনখন শব্দে বাজে এমন খামিরাবিশিষ্ট গারা মাটি) থেকে যে-মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করবার নই।" তিনি বললেন, (আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এলো, যদি অবস্থা এমনই হয়) "তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি তো অভিশপ্ত; এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি রইলো লানত।" সে বললো, "হে আমার প্রতিপালক, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।" তিনি বললেন, "যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে, অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।" সে বললো, "হে আমার প্রতিপালক, আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের কাছে পাপকর্মকে অবশ্যই শোভন করে তুলবো এবং আমি তাদের সবাইকে (সত্যপথ থেকে) বিপথগামী করবো, তবে তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত।" (আমি জানি, তারা আমার ধোঁকায় আল্লাহ বললেন, "এটাই আমার কাছে পৌছাবার সরল পথ[৪], (এটাই আমার সরল পথ, যা আমা পর্যন্ত পৌছে দেবে) পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনোই ক্ষমতা

---

৪ ঈমান ও আমলের পথ যা কুরআনে বর্ণিত আছে।

থাকবে না; অবশ্যই জাহান্নাম তাদের[৫] সবারই প্রতিশ্রুত স্থান।" (কিছুতেই এর অন্যথা হবে না।) [সুরা হিজর : আয়াত ৩১-৪৩]

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا () قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا () قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا () وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا () إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (سورة بنى إسرائيل)

'স্মরণ করো, যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, "আদমকে সিজদা করো", তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। (ইবলিস সিজদার জন্য সে মাথা নত করলো না।) সে বলেছিলো, "আমি কি তাকে সিজদা যাকে আপনি কর্দম থেকে সৃষ্টি করেছেন?" (আমি আমার চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে সিজদা করতে পারবো না।) সে বলেছিলো, "আপনি কি বিবেচনা করেছেন, আপনি আমার ওপর এই ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করলেন, যদি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরদেরকে অবশ্যই কর্তৃত্বাধীন করে ফেলবো।" আল্লাহ বললেন, "যাও, (তুমি তোমার নিজের পথ ধরো) তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তবে জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি, পূর্ণ শাস্তি। তোমার আহ্বানে তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে পারো পদস্খলিত করো, তোমার (সৈন্যসামন্তের) অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর[৬] মাধ্যমে তাদেরকে আক্রমণ করো এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরিক হয়ে যাও এবং তাদেরকে (বিভিন্ন ধরনের) প্রতিশ্রুতি দাও।" শয়তান তাদেরকে যে-প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র (সরাসরি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়)। "নিশ্চয় আমার (একনিষ্ঠ) বান্দাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে

---

[৫] এখানে هُمْ সর্বনাম দ্বারা যারা ইবলিসের অনুসরণ করবে তাদের বোঝানো হচ্ছে।

[৬] যারা আল্লাহপাকের অবাধ্য তারা শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী।—ইমাম রাযি।

তোমার প্রতিপালকই (আল্লাহ তাআলাই) যথেষ্ট।" [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৬১-৬৫]

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ () قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ () قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ () وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ () قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ () قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ () إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ () قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ () إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ () قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ () لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (سورة ص)

'তিনি বললেন, "হে ইবলিস, আমি যাকে নিজ হাতে (আমার কুদরতের হস্ত দ্বারা) সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কীসে বাধা দিলো? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে না-কি তুমি (তার থেকে) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?" সে বললো, "আমি তা থেকে শ্রেষ্ঠ। আমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা (মাটি) থেকে।" তিনি বললেন, "তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত, এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার ওপর আমার লানত স্থায়ী হবে।" সে বললো, "হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে উত্থানদিবস পর্যন্ত (কিয়ামতরে দিন পর্যন্ত, যেদিন সব মানুষকে উঠানো হবে) অবকাশ দিন।" তিনি বললেন, "তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে—অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।" সে বললো, "আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকেই পথভ্রষ্ট করবো, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়।" (তাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করতে পারবো না) তিনি বললেন, "তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি—তোমার দ্বারা এবং তোমার অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবোই।" [সুরা সোয়াদ : আয়াত ৭৫-৮৫]

আদমের খেলাফত

আল্লাহ তাআলা যখন আদম আ.-কে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে আমি জমিনের ওপর (পৃথিবীতে) আমার প্রতিনিধি বানাতে ইচ্ছা করছি। সে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও চিন্তার অধিকারী হবে। আমার জমিনে যে-ধরনের কার্যকলাপ করতে ইচ্ছা করে

সেই কার্যকলাপ সে করতে পারবে। নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারবে। যেনো সে আমার স্বাধীন ক্ষমতার এবং আমার আধিপত্য বিস্তারের প্রকাশক্ষেত্র হবে।

আল্লাহপাকের কথা শুনে ফেরেশতারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন এবং আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন—যদি আপনার এই প্রতিনিধি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও হেকমত এটাই হয় যে, সে দিবারাত্রি আপনার তাসবিহপাঠে মগ্ন থাকবে এবং সবসময় আপনার পবিত্রতা ও মহত্ত্বের গুণগান গাইবে, তবে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তো আমরাই আছি। প্রতিমুহূর্তে আপনার প্রশংসা ও গুণগান করছি এবং বিনা দ্বিধায় আপনার আদেশ পালন করছি। আমাদের কাছে তো এই মাটিনির্মিত জীব থেকে বিবাদ ও কলহের গন্ধ আসছে। এমন না হয় যে এই সৃষ্টি আপনার জমিনে ঝগড়া-ফাসার লাগিয়ে রাখে এবং রক্তপাত ঘটায়। হে আল্লাহ, কোন হেকমতের ভিত্তিতে আপনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন?

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফেরেশতাদেরকে প্রথমত এই আদব শিক্ষা দেয়া হলো যে স্রষ্টার কার্যকলাপ সম্পর্কে সৃষ্ট জীবের তাড়াহুড়া করে কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়। আর স্রষ্টার পক্ষ থেকে মূল তথ্য প্রকাশ করার আগেই কোনো সৃষ্টজীবের সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। তাও আবার এইভাবে যে, সেই সন্দেহের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার আভাস প্রকাশিত হয়। বিশ্বনিখিলের স্রষ্টা যেসব রহস্য অবগত আছেন, তোমরা তা অবগত নও। তাঁর জ্ঞানের আওতায় এমনসব বিষয় রয়েছে যার কিছুই তোমরা জানো না। এ-বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, "আমি পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি", তারা বললো, "আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন (এমন সৃষ্টিকে প্রতিনিধি বানাতে চাচ্ছেন) যে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার (জন্য) সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।"[৭] তিনি

[৭] খলিফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী তা জানার জন্য ফেরেশতাগণ এ-কথা বলেছিলেন।

বললেন, "আমি জানি যা তোমরা জানো না।" (সেই রহস্যের প্রতি আমার লক্ষ রয়েছে। সে-সম্পর্কে তোমরা কোনো খবর রাখো না।) [সূরা বাকারা : আয়াত ৩০]

আদমকে শিক্ষাদান এবং ফেরেশতাদের অপারগতার স্বীকৃতি

এটা মনে করা নিতান্ত ভুল যে ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করার উদ্দেশ্যে বা আল্লাহর কাজের ত্রুটি বের করার উদ্দেশ্যে এ-ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন। বরং তাঁরা আদম আ.-কে সৃষ্টির কারণ জানতে চাচ্ছিলেন। তাঁরা এটাও জানতে চাচ্ছিলেন যে আদমকে সৃষ্টি করার মধ্যে কী হেকমত বা প্রজ্ঞা রয়েছে। তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষা যে, আদম সৃষ্টির হেকমতের রহস্য তাঁদের কাছেও উন্মোচিত হোক। এ-কারণেই তাঁদের বর্ণনাভঙ্গি এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার ত্রুটির প্রতি সতর্ক করার পর আল্লাহ তাআলা ভালো মনে করলেন যে তাঁদের এই জিজ্ঞাসার—বাহ্যিকভাবে যে-জিজ্ঞাসায় আদমকে হীন প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে মনে হয়—জবাব এমনভাবে দেয়া হোক, যাতে ফেরেশতাদের স্বয়ং আদম আ.-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহপাকের উদ্দেশ্য ও হেকমতের মাহাত্ম্য ও উচ্চতা কেবল স্বীকার করাই নয়, বরং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অক্ষমতা ও অপারগতাও তাঁদের গোচরীভূত হয়। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে নিজের সবচেয়ে উঁচুস্তরের গুণ 'ইলম' দান করলেন এবং তাঁকে যাবতীয় বিষয়বস্তুর নাম শিখিয়ে দিলেন। এরপর তিনি সেসব বস্তু ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত করলেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এই বস্তুগুলো সম্পর্কে কী জানো?

তাদের তো 'ইলম' অর্থাৎ জ্ঞান ছিলো না, তাঁরা কী জবাব দেবেন? কিন্তু তাঁরা যেহেতু আল্লাহপাকের নিকটবর্তী ছিলেন তাই বুঝতে পারলেন—এটা আমাদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে নয়। কারণ ইতোপূর্বে এসব বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে তো কোনো জ্ঞানই দেয়া হয় নি। তাই আমাদের পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং আমাদেরকে এ-বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা তাসবিহ ও তাহলিল এবং প্রশংসা ও গুণগান গাওয়া ইত্যাদি ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং ইলম—জ্ঞান নামক গুণের ওপর নির্ভরশীল। কারণ, স্বাধীন ইচ্ছা, আধিপত্য বিস্ত

ারের ক্ষমতা এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের সক্ষমতা—অন্য কথায় বলা যায়, জমিনে শাসনকার্য পরিচালনা করা 'ইলম' নামক গুণ ব্যতীত সম্ভব নয়। আল্লাহ যেহেতু আদম আ.-কে নিজের 'ইলম' গুণ প্রকাশের পূর্ণাঙ্গ ক্ষেত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তিনিই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী; আমরা তার অধিকারী নই।

তা ছাড়া প্রকৃত সত্যও এটাই যে, আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাগণ তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বপালন ব্যতীত সবধনের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তাই তাঁরা ওইসব বস্তুর জ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। অন্যদিকে, হযরত আদম আ.-এর এ-সমুদয় বস্তুর প্রয়োজন ছিলো। তাই এসব বস্তুর জ্ঞান তাঁর জন্য একটি স্বাভাবিক ও সৃষ্টিগত ব্যাপার ছিলো। এই জ্ঞান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তাঁকে দান করা হয়েছে এবং সেসবকিছুই শিখিয়ে দেয়া হয়েছে যা তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ছিলো। উপরিউক্ত বিষয়ে আল্লাহপাক বলেন—

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ () قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ () قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

'(এরপর আল্লাহ যা-কিছু ইচ্ছা করেছিলেন তা অস্তিত্বপ্রাপ্ত হলো এবং প্রকাশ পেলো।) আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম (বস্তুজগতের) শিক্ষা দিলেন। (এই অভ্যন্তরীণ উন্নতি লাভ করলেন যে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সব পদার্থের নাম জেনে নিলেন।) তারপর তিনি ওই সমুদয় (পদার্থকে) ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, "যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহের ক্ষেত্রে) সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও।" তারা বললো, "আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।"' (ফেরেশতারা যখন এভাবে নিজেদের অক্ষমতা ও অপারগতা স্বীকার করে নিলেন) তখন তিনি বললেন, "হে আদম, তাদেরকে এ-সকল (পদার্থের) নাম বলে দাও।" সে তাদেরকে এই সকলের নাম তাদেরকে বলে দিলে তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর

অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত করো বা (তোমাদের অন্তরে) গোপন রাখো তাও আমি জানি?" [সূরা বাকারা : আয়াত ৩১-৩৩]

হযরত আদম আ.-কে যে-জ্ঞান দান করা হয়েছিলো সে-বিষয়ে মুফাস্সিরগণ দুই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। এক প্রকার মত এই যে, বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তু যা অতীতকাল থেকে ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেছে, অস্তিত্ব লাভ করবে বা করছে, সেই সমুদয়ের নাম ও মূলতত্ত্বের জ্ঞান হযরত আদম আ.-কে দান করা হয়েছিলো। দ্বিতীয় প্রকার মত হলো, সে-সময় যে-পরিমাণ বস্তু জগতে বিদ্যমান ছিলো এবং হযরত আদম আ.-এর সামনে উপস্থিত করা হয়েছিলো সে-সমুদয় সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁকে দেয়া হয়েছিলো।

আর الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (সকল বস্তুর নাম) যেমন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে বলা যেতে পারে, তেমনি সেই সময়ের সমস্ত বস্তু সম্পর্কেও বলা যেতে পারে, কোনো ধরনের বিশ্লেষণ ছাড়াই। আর এটাও হতে পারে যে, অধিকাংশ সময় أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ (আমাকে এই সমুদয়ের নাম বলে দাও) কথার মাধ্যমে অস্তিত্বশীল, অনুভূতিগ্রাহ্য অর্থাৎ উপস্থিত বস্তুসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর যদি এ-কথা বলা হয় যে, আয়াতটির অর্থ এই নয় যে বস্তুসমূহের সমস্ত সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণের জ্ঞান দান করা হয়েছিলো; বরং এর অর্থ হলো, বস্তুসমূহের মূল ও ভিত্তি এবং মূলনীতির জ্ঞান দান করা হয়েছিলো, তারপরও الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (সকল বস্তুর নাম) কথাটির সঙ্গে এর বিরোধ ঘটে না।

যাইহোক, হযরত আদম আ.-কে 'ইলম' গুণে এমনভাবে গুণান্বিত করা হয়েছিলো যে ফেরেশতাদের পক্ষেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং খেলাফতের যোগ্যতা স্বীকার না করে উপায় থাকলো না। তাঁদের এ-কথা মানতেই হলো যে—যদি আমাদেরকে আল্লাহর জমিনে তাঁর প্রতিনিধি বানানো হতো, তাহলে সৃষ্ট জগতের যাবতীয় রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতাম। আর আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে যেসব বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান দান করেছেন সে-সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অনবহিত থাকতাম। কারণ, আমাদের তো পানাহারের প্রয়োজন হয় না, যার জন্য আমরা জমিনের মধ্যে নিহিত খাদ্য-দ্রব্য ও ধনভাণ্ডারের অনুসন্ধান করতাম। পানিতে ডুবে যাওয়ার

আশঙ্কাও আমাদের নেই, যার জন্য আমরা নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ করতাম। আমাদের রোগ-ব্যাধির আশঙ্কাও নেই যে এর জন্য আমরা বিভিন্ন ওষুধ জাতীয় বস্তুর বৈশিষ্ট্য, রাসায়নিক যৌগ, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা উপকারিতা, চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভাবন, দেহবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি অংসখ্য প্রকারের বিদ্যা ও বিষয়ের রহস্য ও হেকমত সম্পর্কে অবহিত হতে পারতাম। নিঃসন্দেহে এটা শুধু মানুষের জন্য উপযোগী যে সে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি হবে এবং ওইসব তত্ত্ব, পরিচয়-জ্ঞান, বিদ্যা ও বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্বের যথাযথ অধিকার আদায় করবে।

হযরত আদমের বেহেশতে অবস্থান এবং হাওয়ার সঙ্গে বিবাহ

হযরত আদম আ. এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একাকী জীবনযাপন করতে থাকলেন। কিন্তু তিনি জীবনযাপনে এবং সুখ ও শান্তিতে এক ধরনের নির্জনতা ও একাকীত্ব অনুভব করছিলেন। দেখা গেলো, তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতি কোনো সঙ্গী ও সাথির অন্বেষণ করছে। তাই আল্লাহপাক হযরত হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করলেন। হযরত আদম আ. নিজের জীবনসঙ্গী পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত আদম ও হাওয়া আ.-এর প্রতি এই অনুমতি ছিলো যে বেহেশতের যেখানেই ইচ্ছা তাঁরা বসবাস করবেন, যে-কোনো বস্তু ইচ্ছা ব্যবহার করবেন, যা মন চায় খাবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট একটি বৃক্ষকে দেখিয়ে বলা হয়েছিলো যে—তা (তার ফল) ভক্ষণ করো না, এমনকি তার কাছেও যেয়ো না।

বেহেশত থেকে হযরত আদম আ.-এর বের হয়ে যাওয়া

এখন ইবলিস একটি সুযোগ পেয়ে বসলো। সে হযরত আদম ও হাওয়া আ.-এর অন্তরে এই কুমন্ত্রণা দিলো যে এই নিষিদ্ধ বৃক্ষটি অমর বৃক্ষ। এই বৃক্ষের ফল খেলে চিরন্তন শান্তি ও সুখের সঙ্গে বেহেশতে বসবাস করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা অবধারিত হয়ে যাবে। ইবলিস আরো নানা ধরনের শপথ করে তাঁদের মনে এই বিশ্বাসের জন্ম দিলো যে সে তাঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী, শত্রু নয়। ইবলিসের কথা শুনে হযরত আদম আ.-এর মানবিক স্বভাব ও গুণাবলিতে ভুলত্রুটি (ভুলে যাওয়ার ভুল)

প্রকাশ পেলো এবং তিনি ভুলে বসলেন যে হুকুমটি আল্লাহ তাআলার নিষেধাজ্ঞা ছিলো—কোনো মুরব্বিসুলভ পরামর্শ নয়।

শেষ পর্যন্ত তা অনন্তকাল বেহেশতে বসবাস করা এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকার সংকল্পে দোলায়মান অবস্থা সৃষ্টি করে দিলো। ফলে তাঁরা সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন। তা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানবসুলভ অবধারিত অবস্থা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। দেখতে পেলেন যে তাঁরা দুজনই নগ্ন হয়ে পড়েছেন এবং বেহেশতি পোশাক থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আদম ও হাওয়া উভয়েই গাছের পাতা দিয়ে নিজ নিজ আবরণীয় স্থান (ছতর) ঢাকতে শুরু করলেন। এটা যেনো মানবসভ্যতার শুরু ছিলো যে দেহ আবৃত করার জন্য তাঁরা সর্বপ্রথম গাছের পাতা ব্যবহার করলেন।

ওদিকে এই ঘটছিলো যে আল্লাহ তাআলার তিরস্কার নাযিল হলো এবং আদমের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হলো যে নিষেধ করা সত্ত্বেও তা কেনো লঙ্ঘন করলে? আদম তো আদমই ছিলেন, আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি; তাই তিনি শয়তানের মতো বিতর্কে লিপ্ত হলেন না। নিজের ভুলকে অপব্যাখ্যার আবরণে ঢাকতে চেষ্টা করলেন না। লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে স্বীকার করলেন যে ভুল তো অবশ্যই হয়েছে; কিন্তু তার আল্লাহর অবাধ্যতা নয়; বরং মানবিক স্বভাবজাত ভুলই তার কারণ। তারপরও তা ভুল। এ-জন্য তিনি তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

আল্লাহ তাঁদের এই ওজর কবুল করলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু এদিকে পৃথিবীতে আদম আ.-এর আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার সময় এসে গিয়েছিলো। তাই আল্লাহ তাআলার হেকমতের চাহিদা মোতাবেক সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দেশ জারি করা হলো যে হে আদম, তোমাকে এবং তোমার সন্তানদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জমিনে অবস্থান করতে হবে এবং তোমার শত্রু ইবলিসও তার শত্রুতা ও প্রবঞ্চনার যাবতীয় উপকরণসহ সেখানে অবস্থান করবে। তোমাকে ফেরেশতাসুলভ এবং অবাধ্যতামূলক এই দুই ধরনের বিপরীতমুখী শক্তির মধ্যস্থলে জীবনযাপন করতে হবে। তা সত্ত্বেও তুমি এবং তোমার সন্তানেরা যদি আমার একনিষ্ঠ বান্দা ও সত্যিকার প্রতিনিধি সাব্যস্ত হও, তোমার আসল বাসস্থান বেহেশতকে অনন্তকালের জন্য তোমাদের মালিকানায় দেয়া হবে। সুতরাং, তুমি ও তোমার স্ত্রী আপাতত এখান থেকে চলে যাও, গিয়ে আমার জমিনে

বসবাস করতে থাকো এবং নিজের নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্যন্ত আমার আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগির হক আদায় করতে থাকো।

মানবজাতির আদিপিতা এবং আল্লাহ তাআলার খলিফা হযরত আদম আ. এভাবেই নিজের জীবনসঙ্গিনী হাওয়া আ.-কে নিয়ে পৃথিবীতে পদার্পণ করলেন। এ-সম্পর্কে আল্লাহপাক বর্ণনা করেছেন—

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ () فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ () فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ () قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'এবং (ব্যাপার এই হলো যে) আমি বললাম, "হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার করো, (নিরাপদ ও শান্তিময় জীবনযাপন করো) কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; (ওই বৃক্ষের নিকটবর্তী) হলে (ফল এই দাঁড়াবে যে) তোমরা (সীমালঙ্ঘন করে বসবে এবং) অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যেখানে ছিলো সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করলো। (অনন্তর শয়তানের কুমন্ত্রণা তাঁদের দোদুল্যমান করে দিলো এবং শান্তি ও আরামের জীবন থেকে তাদেরকে বের করে দিলো।) আমি বললাম, " তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইলো।" (এখন তোমাদেরকে জান্নাতের পরিবর্তে দুনিয়াতে বসবাস করতে হবে।) তারপর আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাণীপ্রাপ্ত হলো। (কতিপয় কালিমা শিখে নিলেন যা আল্লাহর কাছে মাকবুল ছিলো।) আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। (আল্লাহ আদম আ.-এর তওবা কবুল করলেন।) তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (আদমের তওবা কবুল হলেও বেহেশতের জীবন থেকে তিনি বহিষ্কৃত হলেন। সেই জীবন দ্বিতীয়বার লাভ করা সম্ভব ছিলো। সুতরাং,) আমি বললাম, "তোমরা সকলেই এই স্থান থেকে নেমে যাও। (এবং যে-নতুন জীবনের সূচনা হচ্ছে তা অবলম্বন করো।) পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের কোনো নির্দেশ

আসবে (তোমাদের জন্য দুটি পথই খোলা থাকবে) তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে (তারা সফলতা ও সৌভাগ্য লাভ করবে) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" [সূরা বাকারা: আয়াত ৩৫-৩৮]

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ () فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ () وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ () فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ () قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ () قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ () قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (سورة الأعراف)

""হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখানে ইচ্ছা আহার করো, (যে-বস্তু পছন্দ হয় তাই শখ করে খাও) কিন্তু (দেখো, এই যে বৃক্ষটি রয়েছে) এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; হলে (যদি নিকটবর্তী হও, তাহলে স্মরণ রেখো) তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" তারপর তাদের লজ্জাস্থান যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিলো তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে (তাঁদের উভয়ের অন্তরে) কুমন্ত্রণা দিলো এবং বললো, "(এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে) পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ-জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্পর্কে (বৃক্ষের ফল খেতে) তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।" সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বললো, (সে নানা ধরনের কসম খেয়ে খেয়ে তাঁদের মনে এই বিশ্বাসের জন্ম দিলো যে) "আমি তো তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।" এইভাবে সে (শয়তান এই ধরনের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে অবশেষে) তাদেরকে প্রবঞ্চনার মাধ্যমে অধঃপতিত করলো। তারপর যখন তারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো, তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং (যখন

নিজেদের অবস্থা দেখে লজ্জা অনুভব করলেন তখনই) তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করি নি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?" তারা বললো, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, (আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছি) যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং দয়া না করো তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" (আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি ছাড়া আর কিছু নেই) তিনি বললেন, "তোমরা নেমে যাও,[৮] তোমরা একে অপরের শত্রু এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইলো।" (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিকানির্বাহের উপকরণ থেকে ফায়দা হাসিল করতে থাকবে) তিনি বললেন, "সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।"'
[সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৯-২৫]

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا () وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى () فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى () إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى () وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى () فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى () فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى () ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى () قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (سورة طه)

'(আর ব্যাপার এই যে,) আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, (কড়াকড়িভাবে আদম থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম) কিন্তু সে (প্রতিশ্রুতি) ভুলে গিয়েছিলো; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নি। (আমি তার মধ্যে অবাধ্যতার ইচ্ছা পাই নি।) স্মরণ করো, যখন

[৮] আদম সন্তান এবং শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

ফেরেশতাদের বললাম, "আদমের প্রতি সিজদা করো",—তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো; সে অমান্য করলো। তারপর আমি বললাম, "হে আদম, নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেনো কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে। তোমার জন্য এটা রইলো যে তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না এবং নগ্নও হবে না; আর সেখানে তৃষ্ণার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।" (যদি এখান থেকে বহিষ্কৃত হও, তবে নিতান্তই দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে।) এরপর শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিলো; সে বললো, "হে আদম, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা এবং অক্ষয় রাজ্যের কথা?" (যা কখনো তোমাদের হস্তচ্যুত হবে না) এরপর তারা উভয়ই (আদম ও হাওয়া আ.) তা থেকে (তার ফল) ভক্ষণ করলো; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগলো। আদম তার প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করলো, ফলে সে ভ্রান্তিতে পতিত হলো। (জান্নাতের জীবন থেকে বিপথে চলে গেলো।) এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথনির্দেশ করলেন। (জীবনযাপন ও আমলের পথ খুলে দিলেন।) তিনি বললেন, "তোমরা উভয়ে (আদম ও শয়তান) একইসঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। (এখন থেকে তোমাদের জন্য অন্য এক জীবনের পথ উন্মোচিত হবে) পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের (বংশধরগণের) কাছে সৎপথের নির্দেশ এলে (তবে এ-সম্পর্কে আমার বিধান মনে রেখো) যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না (কখনো সে সৎপথ থেকে বিভ্রান্ত হবে না।) এবং দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে না।"' [সূরা তোয়া-হা : ১১৫-১২৩]

ঘটনা-সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

ঘটনার এই বিস্তারিত বিবরণের পর এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার ওপরও আলোকপাত করা জরুরি যেগুলো ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণে বিশেষভাবে সহায়ক সাব্যস্ত হবে।

এক : আদম সৃষ্টি

এই মাসআলাটিও প্রণিধানযোগ্য যে আদিমানব হযরত আদমের সৃষ্টিকর্ম কখন হয়েছিলো। আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে না-কি তার অনির্দিষ্টকাল পরে আদমের অস্তিত্ব এই সৃষ্টিজগতে এসেছে।

ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আলেমগণ এবং মুসলিম সম্প্রদায়েরও কয়েকজন আলেমের মত হলো, আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে ছয় দিনের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই দিনগুলোর মধ্য থেকে একদিন হযরত আদম আ.-ও অস্তিত্বের জগতে আগমন করেছেন এবং তা ছিলো জুমার দিন শুক্রবার। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا (سورة الأعراف)

'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ছয় দিনে[৯] সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি আরশে[১০] সমাসীন হন। তিনি দিবসকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ৫৪]

কিন্তু এই জুমার দিন মতটি সঠিক নয়। জ্ঞান ও ইতিহাসের দিক থেকেও তা সঠিক নয়, ধর্মীয় রেওয়ায়েতের দিক থেকেও সঠিক নয়। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে তো জানা নেই যে তাঁরা কিসের ওপর ভিত্তি করে এই মত প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের কাছে কী প্রমাণ আছে যে আদমকে জুমার দিন সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা সুবকির[১১] প্রতি

---

[৯] এটা পৃথিবীর চব্বিশ ঘণ্টার দিন নয়। সুরা মাআরিজের চতুর্থ আয়াত দ্রষ্টব্য।

[১০] 'আরশ' শব্দের শাব্দিক অর্থ ছাদবিশিষ্ট কিছু। আরবদেশে ছাদবিশিষ্ট হাওদাকে আরশ বলে। রাজার আসন বুঝাতেও আরশ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর আরশ বলতে সৃষ্টির ব্যাপারে বিষয়াদির পরিচালনা-কেন্দ্র বুঝায়।— (মুফতি আবদুহু)
আল্লাহপাকের অসীমত্বের কিছুটা ধারণা দেয়ার জন্য 'আল-আরশুল আজিম' এই রূপকটি ব্যবহৃত হয়।—ইমাম রাযি।

[১১] পুরো নাম আবদুল ওয়াহাব বিন আলি বিন আবদুল কাফি আস-সুবকি। জন্ম কায়রোতে ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু দামেস্কে ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে। শাফিঈ তরিকার বিখ্যাত ফকিহ, মূলনীতিবিদ ও ঐতিহাসিক। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ :

অবশ্যই বিস্ময় প্রকাশ করতে হয় যে তিনি এই প্রমাণবিহীন কথাটি কীভাবে গ্রহণ করলেন এবং এই মত কেমন করে অবলম্বন করলেন?

যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার পর এটা বলা যেতে পারে যে আল্লামা সুবকি রহ. সহিহ্ মুসলিম-এর হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলে পতিত হয়েছেন। জুমার দিনের ফযিলত সম্পর্কে এই হাদিসটি সহিহ্ মুসলিম-এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আদমের সৃষ্টিকর্ম জুমার দিন সংঘটিত হয়েছে।'[১২]

এ-হাদিসটিতে শুধু এ-পর্যন্তই উল্লেখ আছে; কিন্তু আল্লাম সুবকি রহ. নিজের পক্ষ থেকে এই কথাটুকু বাড়িয়ে দিয়েছেন যে এই জুমার দিন সেই ছয়দিনের এক দিন (যাতে আল্লাহ তাআলা বিশ্বনিখিল সৃষ্টি করেছেন)—এটাই আল্লামা সুবকির ভুল।

প্রকৃত অবস্থা এই যে, কুরআন মাজিদ অনেক জায়গায় বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছে; কিন্তু কোনো একটি স্থানেও এর সঙ্গে আদম আ.-এর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে নি। অথচ এটা স্পষ্ট যে, জমিন ও আসমানের চেয়ে হযরত আদম আ.-এর উল্লেখ অধিক প্রয়োজনীয় ছিলো। কুরআনের ভাষায় যিনি أشرف المخلوقات অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা এবং خليفة الله في الأرض অর্থাৎ দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফা নামে অভিহিত হয়েছেন। তবে এটা কী করে সম্ভব যে এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে উল্লিখিত ছয়দিনের কোনো এক দিনে সৃষ্টি করলেন অথচ তার উল্লেখ করা হলো না। إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ আয়াতগুলোতে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি বিষয় হলো পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় বিষয় হলো আরশের ওপর আল্লাহপাকের অধিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টি-সংক্রান্ত পরিষ্কার উল্লেখ তো দূরের কথা সেদিকে কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তা ছাড়াও কথা হলো, কুরআন মাজিদ যে যে স্থানে হযরত আদম আ.-এর আলোচনা যেভাবেই

شرح مختصر ابن الحاجب، شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه المسمى الإبهاج شرح المنهاج؛ القواعد المشتملة على الأشباه والنظائر، طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى؛ الترشيح في اختيارات والده؛ جمع الجوامع في أصول الفقه؛ وشرحه المسمى منع الموانع. توفي بدمشق.

[১২] দেখুন : সহিহ্ মুসলিম : হাদিস ২০১৩, ২০১৪।

করেছে, তার মধ্যে কোনো একটি স্থানেও তাঁর জন্মদিবসের উল্লেখ নেই। সুতরাং এ-বিষয়ে পরিষ্কার বক্তব্য হলো, প্রকৃত সত্য এটাই যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার হাজার হাজার-লাখ লাখ বছর পরে এবং এক অনির্দিষ্ট সময়কালের পরে (যার দীর্ঘতার পরিমাণ একমাত্র দৃশ্য-অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলাই জানেন) হযরত আদম আ.-কে কোনো এক জুমার দিন (শুক্রবার) অস্তিত্বের জগতের আনা হয়েছে। উল্লিখিত ছয়দিনের মধ্যকার জুমার দিনে কাউকে সৃষ্টি করা হয় নি; বরং আরশের ওপর সমাসীন হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। এ-কারণেই জুমার দিনটিকে পর্বদিবস বা ছুটির দিন হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

দুই. حواء (হাওয়া) ও ادم (আদম) নাম দুটি আরবি না-কি অনারবি? আর কিসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নাম দুটি রাখা হয়েছে, না-কি শুধু নাম হিসেবেই রাখা হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ইবনে হাজার মক্কি রহ.-এর মত এটা জানা যায় যে, এই নামগুলো 'সুরিয়ানি' নাম; আরবি নয়। আর বাইবেলে (ا) 'আলিফ' অক্ষরটির ওপর স্বর দীর্ঘকারী مد 'মদ' এবং 'দাল' অক্ষরটিকে লম্বা উচ্চারণের সঙ্গে آدام আ-দা-ম পড়া হয়। আল্লামা যাওহারি ও যাওয়ালিকি রহ. বলেন, এগুলো আরবি নাম।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্পর্কে আল্লামা সালাবি[৩] রহ. বলেন , হিব্রু ভাষায় মাটিকে آدام (আদাম) বলা হয়। যেহেতু তাঁকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই সামঞ্জস্যের কারণেই তাঁর নাম آدام (আদাম) রাখা হয়েছে। আবার কারো কারো মতে, ادم শব্দটি ادمة উদমাতুন থেকে গৃহীত হয়েছে; ادمة উদমাতুন বা ادم الأرض (আদিমুল আরদ) অর্থাৎ জমিনের উপরিভাগ থেকে নেয়া মাটি দিয়ে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর এ-জন্যই তাঁর নাম হয়েছে আদম (ادم)।

অন্য কয়েকজন আলেম বলেন, ادم শব্দটি ادمت—যার অর্থ خلطت (মিশ্রিত হয়েছে)—শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। তা এই সামঞ্জস্যের কারণে যে আদম আ.-এর দেহের খামির পানি ও মাটির মিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়েছিলো। এভাবে حواء (হাওয়া) শব্দটি এ-জন্য হযরত আদম আ.-এর স্ত্রীর নাম হয়েছে যে তিনি সমস্ত انسان حى অর্থাৎ জীবনধারী মানুষের মাতা। حى-এর مبالغة অর্থাৎ আধিক্যব্যঞ্জক রূপ প্রদান করে নাম حواء নাম রাখা হয়েছে।

যাইহোক, নাম ও অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। তাই বর্ণিত প্রকরণগুলো একইসঙ্গে শুদ্ধ হতে পারে আবার তার কোনো একটিতে প্রাধান্যও দেয়া যেতে পারে। কেননা এই বিষয়টি খুবই ব্যাপক।

তিন. হযরত আদম আ.-কে সিজদা করার জন্য আল্লাহ যে-আদেশ করেছিলেন তা ফেরেশতাদের উদ্দেশে করেছিলেন। আর ইবলিস জিন জাতি, ফেরেশতা জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাহলে আল্লাহপাকের তিরস্কার ও অভিশাপ কেনো বর্ষিত হলো? এই প্রশ্নের জবাব এই যে, ইবলিস যে ফেরেশতা জাতীয় নয় এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, কুরআন মাজিদে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে—

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

'সে জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো।' [সূরা কাহফ : আয়াত ৫০]

কিন্তু আল্লাহ যখন আদম আ.-কে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন তখন ইবলিস সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলো এবং অজ্ঞাত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফেরেশতাদের সঙ্গে তাসবিহ ও তাহলিল পাঠে মগ্ন ছিলো। এ-কারণে সেও এই আদেশে আদিষ্ট ছিলো এবং নিজেকে এই আদেশে আদিষ্ট বলে মনে করছিলো। এ-কারণেই আল্লাহ তাআলা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেনো সিজদা করলে না, তখন সে এই উত্তর প্রদান করে নি যে আমি ফেরেশতা নই, কাজেই এই আদেশে আদিষ্টই ছিলাম না, তাই সিজদা করি নি। বরং অহংকারের সঙ্গে বলেছিলো, "আমি আদমের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ, কাজেই সিজদা থেকে বিরত রয়েছি।"

এটাই সঠিক উত্তর। অন্যথায়, কেউ কেউ এই দুর্বল উত্তরটিও দিয়ে থাকেন যে, আল্লাহর ফেরেশতাদের মধ্য থেকে প্রকার বিশেষকে জিনও বলা হয়। ইবলিস সেই প্রকারের ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন ফেরেশতা ছিলো। কিন্তু এই মতের প্রতি সমর্থন কুরআন মাজিদেও পাওয়া যায় না এবং বিশুদ্ধ হাদিসসমূহেও না।

চার. ইবলিসকে যখন জান্নাত থেকে বিতাড়িত করে বহিষ্কার করা হলো, এরপর তার পক্ষে হযরত আদম ও হাওয়া আ.-কে কীভাবে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হলো?

মুসলিম উলামায়ের কেরাম থেকে এই প্রশ্নের দু-ধরনের জবাব বর্ণিত হয়েছে। দুটি জবাবই কোনো ধরনের দূরবর্তী ব্যাখ্যা ছাড়া বোধগম্য হয়।

ক. যদিও ইবলিসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো, কিন্তু তারপরও এক পাপিষ্ঠ ও নিকৃষ্ট মাখলুকরূপে জান্নাতের ভেতরে প্রবেশ তার বিতাড়িত হওয়ার বিরোধী নয়। এ-কারণে ইবলিস এভাবেই জান্নাতে প্রবেশ করে হযরত আদম ও হাওয়া আ.-এর সঙ্গে এই কথোপকথন করেছিলো এবং তাদেরকে প্রবঞ্চনার শিকার বানিয়েছিলো। اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا। 'তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও', কথাটি এই বক্তব্যেরই সমর্থন করছে যে পাপিষ্ঠ মাখলুকরূপে তখন পর্যন্ত জান্নাতে ইবলিসের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নি।

খ. যেভাবে একটি টেলিফোন ও রেডিওর সাহায্যে অনেক দূরে যেতে পারে, ওয়ারলেসে যেভাবে শুধু আলো ও শব্দতরঙ্গের সাহায্যে একটি সংবাদ হাজার হাজার মাইল দূরে পৌছানো যেতে পারে, তেমনি এটাও কেনো সম্ভব হবে না যে নিকটবর্তী ও মুখোমুখি হয়ে সম্বোধন করা ছাড়াই শয়তানের কুমন্ত্রণা মানুষের অন্তরে পৌছে যায় এবং ক্রিয়া করে। তবে আলোচ্য ক্ষেত্রে কুমন্ত্রণা প্রদানের অবস্থা এমন হবে যে শয়তান জান্নাতের বাইরে থেকেই হযরত আদম ও হাওয়া আ.-এর অন্তরে এই কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো এবং তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলো। فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ। 'শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো', আয়াতটি থেকে এ-বক্তব্যের সমর্থনই প্রকাশ পাচ্ছে।

পাঁচ. হাওয়া আ.-এর জন্ম কীভাবে হলো?

কুরআন মাজিদে এ-সম্পর্কে শুধু এতোটুকু উল্লেখ আছে : وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا 'আর সেই নফস (আদম) থেকে তাঁর জোড়াকে (তাঁর স্ত্রীকে) সৃষ্টি করেছেন।'[১৪] কুরআন মাজিদের এ-বাক্যটি থেকে হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এখানে দুই ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে : ১. হাওয়া আ.-কে হযরত আদম আ.-এর পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং এটা প্রসিদ্ধ। বাইবেলেও এ-ধরনের বক্তব্যই বর্ণিত হয়েছে। ২. আল্লাহ তাআলা মানববংশকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, পুরুষের সঙ্গে তারই স্বজাতীয় অপর এক মাখলুকও তিনি সৃষ্টি করেছেন, যাকে নারী বলা হয় এবং পুরুষের জীবনসঙ্গিনী হয়ে থাকে।

আয়াতটির তাফসিরে বিশেষজ্ঞদের অভিমত উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকেই সমর্থন করছে। এর সারমর্ম হলো, কুরআন মাজিদ শুধু হযরত হাওয়ার সৃষ্টিকর্মেরই উল্লেখ করছে না; বরং নারী জাতির সৃষ্টিকর্মের সম্পর্কে এই তত্ত্ব প্রকাশ করছে যে নারী জাতি পুরুষেরই স্বজাতীয় এবং একইভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য সহিহুল বুখারি ও সহিহু মুসলিম-এ বর্ণিত হাদিসসমূহে এ-বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে যে নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হাদিসের বক্তব্য এই—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। (আমার কাছ থেকে নারীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ করো।) তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হাড় হলো উপরেরটা (আর তা থেকেই নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে)। সুতরাং তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙে ফেলবে; আর যদি

---

[১৪] সূরা নিসা : আয়াত ১।

ফেলে রাখো তাহলে সবসময় তা বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।'[১৫]

ইবনে ইসহাক হাদিসের এই অর্থ করেছেন : হযরত হওয়াকে হযরত আদম আ.-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু ইবনে ইসহাকের চেয়ে অধিক তত্ত্বজ্ঞানী এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বসন্ধানী আল্লামা কুরতুবি এর এই অর্থ বলেছেন : আসলে এখানে স্ত্রীজাতিকে পাঁজরের হাড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, নারী জাতির সৃষ্টিকর্ম প্রথমে পাঁজরের হাড় থেকে শুরু করা হয়েছে। তাদের অবস্থা পাঁজরের হাড়ের মতোই বাঁকা; তাদের এই বক্রতাকে সোজা করতে চাইলে তা ভেঙে যাবে। পাঁজরের হাড়ের বক্রতা সত্ত্বেও তার থেকে কাজ নেয়া হয়ে থাকে এবং তার বক্রতাকে সোজা করার চেষ্টা করা হয় না। তেমনিভাবে, নারী জাতির সঙ্গে নম্র ও কোমল ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় কঠোর ব্যবহারে পারস্পরিক সম্পর্কের মধুরতা ও কমনীয়তার পরিবর্তে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ছয়. হযরত আদম আ. যে-জান্নাতে অবস্থান করছিলেন এবং যেখান থেকে তাঁকে জমিনে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কোন জান্নাত? 'জান্নাতুল মাওয়া', যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর মুমিনদের বাসস্থান হবে, না-কি পৃথিবীর কোনো জান্নাত, যা এই পৃথিবীতেই কোনো সুউচ্চ ও প্রশস্ত স্থানে নির্মাণ করা হয়েছিলো?

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম উলামায়ে কেরামের অভিমত এই যে, তা জান্নাতুল মাওয়া। মুসলমানদেরকে পরকালে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাঁরা বলেন, কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনেক হাদিসের বাহ্যিক বর্ণনা থেকে এটাই পরিষ্কার বুঝা যায়।

ক. যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন— وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 'এবং আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো।'

[১৫] সহিহুল বুখারি : ৫১৮৫ : সহিহ মুসলিম : ৩৭২০।

এখানে আরবি ব্যাকরণ অনুসারে শব্দটিকে নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক الف-لام আলিফ-লাম-এর সঙ্গে উল্লেখ করাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এটা সেই বিখ্যাত জান্নাত, কুরআন মাজিদের স্থানে স্থানে যাকে পরকালে মুমিনদের বাসস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায়, কোনো নতুন স্থানের উল্লেখ করা হলে প্রথমে তার তথ্য প্রকাশ করে দেয়া হতো। এরপর তাকে জানা ও চেনা বস্তুর মতো এমনিভাবে নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক لام লাম-এর সঙ্গে উল্লেখ করা হতো।

খ. আল্লাহ তাআলা বলেন— اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا 'তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও।' উপর থেকে নিচে অবতরণ করাকে 'নেমে যাওয়া' বলে। সুতরাং বুঝা যায়, আলোচ্য জান্নাতটি পৃথিবীর কোথাও অবস্থিত হতে পারে না; বরং জান্নাতুল মাওয়া অর্থাৎ সেই বিখ্যাত জান্নাতই হতে পারে পরকালে মুমিনদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

গ. সহিহ্ মুসলিম-এর একটি লম্বা হাদিসে নিম্নবর্ণিত বাক্যগুলো রয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ

হযরত হুযাইফা ও আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন। তখন মুমিনগণ এক স্থানে দাঁড়াবে। অবশেষে বেহেশতকে তাদের নিকটবর্তী করা হবে। এরপর তারা হযরত আদম আ.-এর কাছে এসে বলবে, হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য বেহেশত খুলে দিন। তিনি বলবেন, তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে। সুতরাং আমি এই কাজের উপযুক্ত নই।'[১৬]

উপরিউক্ত বর্ণনার বিপরীতে একদল উলামা বলেন, এই পৃথিবীরই স্থানসমূহের কোনো এক স্থানে অবস্থিত ছিলো; 'জান্নাতুল মাওয়া' ছিলো

---

[১৬] সহিহ্ মুসলিম : হাদিস ৫০৩।

না। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে বলেন, কুরআন মাজিদের আয়াতগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে যে আল্লাহপাক আদম ও হাওয়া আ.-কে উক্ত জান্নাতে পানাহারের আদেশ করেছিলেন। কেবল একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। আবার আদম আ. সেখানে শান্তি ময় নিদ্রায়ও থাকতেন। ইবলিসও সেখানে যাতায়াত করতো। সে হযরত আদম আ.কে বিভ্রান্ত করেছিলো। এরপর ইবলিস, হযরত আদম আ. ও হযরত হাওয়া আ. ওখান থেকে বহিষ্কৃত হলেন। এ-বিষয়গুলো দুনিয়ার সঙ্গে নির্দিষ্ট। এ-বিষয়গুলো 'জান্নাতুল মাওয়া'র মধ্যে নেই। কেননা, সেখানে আদেশ-নিষেধও নেই এবং সেখানে প্রবেশ করার পর বহিষ্করণও নেই।

এই কথাগুলো ইসলাম ধর্মের বড়ো বড়ো আলেমের উক্তি বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরিউক্ত দুটি মত ছাড়া এ-বিষয়ে আরো দুটি মত রয়েছে। এভাবে এ-বিষয়টি সম্পর্কে মত বা উক্তি হয় চারটি : ১। তা জান্নাতুল মাওয়া; ২। তা পৃথিবীর জান্নাত; ৩। তা জান্নাতুল মাওয়া ও পৃথিবীর জান্নাত ছাড়া একটি তৃতীয় জান্নাত যা শুধু এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছিলো। ৪। এ-বিষয়ে কোনো উক্তি না করে নীরব থাকা বাঞ্ছনীয় এবং এ-বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার প্রতিই ন্যস্ত করা উচিত।

এ-বিষয়টির আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। হাফিয ইমামুদ্দিন ইবনে কাসির তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'য় এ-বিষয়টিকে খুব বিশদ ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং যাবতীয় বক্তব্যকে বিস্ত ারিত প্রমাণ ও উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত বিবরণ দেখতে চাইলে উক্ত কিতাবটি অধ্যয়ন করা উচিত।

যাইহোক, প্রকৃত সত্য তো আল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন। কিন্তু সব দলিল-প্রমাণ দেখে আমাদের সিদ্ধান্ত তো এটাই যে এই ঘটনাটি নিঃসন্দেহে 'জান্নাতুল মাওয়াতে'ই ঘটেছিলো। আর পানাহার করা, শয়ন করা, নিদ্রায় যাওয়া এবং ওয়াসওয়াসা—কুমন্ত্রণা প্রদানের জন্য শয়তানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড জান্নাতুল মাওয়াতে সেই সময়েই সম্পন্ন হয়েছিলো যখন মানুষ তখনো পর্যন্ত বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত পৃথিবীতে আগমন করে নি। সুতরাং যা-কিছু ঘটেছে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাপ্রসূত পূর্ণ হেকমতের আওতায় ঘটেছে। তা এ-জন্য যে, এসব

সৃষ্টিগত অনিবার্য বিষয় পৃথিবীতে মানবজাতির আবাদ হওয়া এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হওয়ার জন্য অবধারিত ছিলো। যদি এই উক্তিটিই প্রণিধানযোগ্য হয় যে এখানে জান্নাত বলতে জান্নাতুল মাওয়াই উদ্দেশ্য, তাহলে এ-ধরনের প্রশ্ন উদ্ভূত হয়— হযরত আদম ও হাওয়া আ.-কে পৃথিবীর কোন অংশে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো? এ-সম্পর্কে কিছু দুর্বল বর্ণনা দেখা যায় হযরত আদম আ.-কে হিন্দুস্তানে এবং হযরত হাওয়া আ.-কে জেদ্দায় নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তারপর এক দীর্ঘকাল পরে তাঁরা দুজনই হেজাযের আরাফাত নামক স্থানে একত্রে মিলিত হলেন। এ-কারণে হজের এই ময়দানটির নাম হয়েছে আরাফাত (জানাশোনা)। কেননা, এখানে তাঁরা পরস্পর মিলিত হয়ে একে অপরকে চিনতে পেরেছিলেন।

কিন্তু কুরআন মাজিদ ঘটনার এই অংশটি সম্পর্কে নীরব রয়েছে। কারণ এই বিষয়টি প্রকাশ করার সঙ্গে হেদায়েত ও নসিহতের কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য অন্তরের প্রবল ধারণা এ-দিকে ধাবিত হয় যে হযরত আদম ও হাওয়া আ. একই স্থানে অবতারিত হয়ে থাকবেন। কেননা, তাহলে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ হেকমতের চাহিদা অনুযায়ী সত্বরই মানজাতির বংশবৃদ্ধির কাজ শুরু হতে পারবে। এই জড়জগতের উত্তরাধিকারী ও অধিবাসীরা জমিনকে আবাদ করে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা 'দুনিয়ার খেলাফতের' পুরোপুরি হক আদায় করতে পারবে।

কৌতুকপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয়

আদম আ.-কে যে-জান্নাতে বসবাস করতে বলা হয়েছিলো, যেসব উলামায়ে কেরাম তা জান্নাতুল মাওয়া বলে মত প্রকাশ করেন, অন্য পক্ষ তাঁদের প্রতি এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, (তাঁদের উল্লিখিত) এই বক্তব্য যদি সত্য বলে মেনে নেয়া হয়, তবে কথা হলো, জান্নাতুল মাওয়ার অপর নাম জান্নাতুল খুলদ অর্থাৎ অনন্ত জীবনযাপনের জান্নাত। তাহলে ইবলিস যে আদম আ.-কে বলেছিলো, আমি কি আপনাকে অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের (শাজারাতুল খুলদ) সন্ধান দেবো?—তার অর্থ কী? (জান্নাতুল মাওয়া বা জান্নাতুল খুলদে তো অনন্ত জীবনযাপন হবেই, শাজারাতুল খুলদ বা অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের প্রয়োজন কী?)

কিন্তু প্রথম দলের উলামায়ে কেরাম ওইসব আলেমকে, যাঁরা জমিনের জান্নাত বলে মত পোষণ করেন, পাল্টা প্রশ্ন করলেন, যদি সেই জান্নাতটি জমিনের জান্নাতই হতো, তাহলে এই অস্থায়ী পৃথিবীতে ইবলিস হযরত আদমের সঙ্গে এমন আলোচনা কেমন করে করতে পারতো? কারণ, পৃথিবী ও তার যাবতীয় বস্তুই তো অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল; কিন্তু তাতে আবার এমন বৃক্ষ আছে যার ফল খেলে অমরত্ব লাভ হয়। তা কেমন করে সম্ভব? ধ্বংসশীল পৃথিবীতে অমরত্ব কোথায়? এটা তো সাধারণ বুদ্ধির একজন মানুষও মেনে নিতে পারে না, হযরত আদম আ. তো দূরের কথা।

ভূ-তত্ত্ববিদদের দৃষ্টি পৃথিবীর জান্নাত

যেসব উলামায়ে কেরাম এই উল্লিখিত জান্নাতকে পৃথিবীর জান্নাত বলেন, তাঁরা বলেন, পৃথিবীর লোকবসতিপূর্ণ যে-অংশে উল্লিখিত জান্নাত অবস্থিত ছিলো তা আজ বিশ্বজগতের ওপর বিদ্যমান নেই। ওই অংশটি 'কারায়ে মাও' নামে এই পৃথিবীতে আবাদ ছিলো। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার আবর্তন-বিবর্তন ও ভূমিকম্পের কারণে হাজার হাজার বছর আগে তা ভারত মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। যখন এই ঘটনাটি ঘটেছিলো তখন উক্ত অংশের বসবাসকারীদের সংখ্যা ছিলো ছয় কোটি। সব মানুষ সেই ঘটনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

বাইবেলে উল্লেখ আছে, যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছিলো সেখান থেকে দাজলা ও ফোরাত নদী দুটির উৎপত্তি হয়েছে।

সাত. হযরত আদম আ. কি একইসঙ্গে নবী ও রাসুল ছিলেন?

ইসলামি শরিয়তে নবী তাঁকে বলা হয় যাঁকে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং তিনি আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করেন। আর রাসুল সেই নবীকে বলা হয় যাঁর প্রতি নতুন শরিয়ত ও নতুন কিতাব নাযিল করা হয়েছে।

হযরত আদম আ. মানবজাতির আদিপিতা। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন জাগে যে, তিনি যেমন নিজের বংশধরগণের পার্থিক সৌভাগ্য ও কল্যাণের পথপ্রদর্শক ছিলেন, তেমনি পরকালীন মুক্তি, সৌভাগ্য ও মঙ্গলের জন্যও নবী ছিলেন কি-না?

এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তরই হতে পারে যে তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার সত্যিকারের পয়গম্বর ও সত্য নবী ছিলেন। এ-বিষয়ে কখনো উম্মতের মধ্যে দ্বিমত হয় নি; তাই এই মাসআলাটি আলোচনায় আসে নি। কিন্তু এ-বিষয়টি তখন থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যখন মিসরের কোনো গ্রামের জনৈক ব্যক্তি হযরত আদম আ.-এর নবুওত অস্বীকার করেছে এবং নিজের দাবির প্রমাণ হিসেবে বলেছে যে কুরআন মাজিদের কোথাও আদমকে অন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের মতো 'নবী' বলা হয় নি।

এই ব্যক্তি এই উক্তি—পবিত্র কুরআন হযরত আদমকে কোনো স্থানেই নবী বলে সম্বোধন করে নি—শব্দের দিক থেকে ঠিক হলেও নবুওতের মৌলিক অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ইসলামি পরিভাষায় নবুওতের যে-অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই হযরত আদম আ.-এর প্রতি তার প্রয়োগ কুরআনের অনেক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। নানা স্থানে এ-কথা প্রমাণিত রয়েছে যে আল্লাহ তাআলা কোনো মাধ্যম ব্যতীতই হযরত আদমের সঙ্গে কথোপকথন করেছেন। আর এসব সম্বোধন ও কথোপকথনে আদেশ-নিষেধ এবং হালাল-হারামের বিধি-বিধানও প্রদান করেছেন। এই বিধানসমূহ পৌঁছানোর জন্য হযরত আদম আ.-এর কাছে কোনো নবী বা রাসুল প্রেরণ করা হয় নি; বরং আল্লাহ তাআলা সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করে তা বলেছেন। সুতরাং, নবুওতের মৌলিক অর্থ যখন এটাই, তাহলে হযরত আদম আ.-এর নবুওত অস্বীকার করা নিশ্চিতভাবে বাতিল এবং সম্পূর্ণ নিরর্থক। তা ছাড়া তাঁর রাসুল হওয়া বা না হওয়ার আলোচনাটিও তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ তিনি ছিলেন প্রথম মানুষ। তৎকালীন মানবজাতির জন্য আল্লাহপাকের ওহির মাধ্যমে যেসব পয়গাম ও বাণী তিনি শুনিয়েছেন তাই তাঁর শরিয়ত বলে মনে করতে হবে এবং এ-কারণেই তিনি রাসুল।

সারকথা, তাঁর নবুওতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখার জন্য এবং অন্তরে শান্তি ও তৃপ্তি সৃষ্টি করার জন্য কুরআন মাজিদের ওইসব আয়াতই শক্তিশালী ও যথেষ্ট প্রমাণ, যা হযরত আদম আ. এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে সরাসরি সম্বোধন ও কথোপকথনের আকারে দৃষ্ট হচ্ছে।

হযরত আবু যর গিফারি রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরজ করলেন, 'ইয়া

রাসূলাল্লাহ, আমাকে বলুন আদম আ. নবী ছিলেন কি-না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, "হ্যাঁ তিনি নবী ছিলেন এবং রাসূলও ছিলেন। তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।"'

হাদিসের বাণী এই—

عن أبي ذر: قال: قلت: يا رسول الله؛ اريت آدم، انبيًّا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا كلمه الله قبلا فقال: { اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ }

হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আদমকে দেখেছেন, তিনি কি নবী ছিলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, নবী ও রাসূল ছিলেন; ইতোপূর্বে আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো।"[১৭]

আট. হযরত আদম আ. যখন নবী বলে প্রমাণিত হলেন, তো তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘিত হওয়ার অর্থ কী? নবী তো নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। নিষ্পাপ হওয়া তো আবাধ্যাচরণ ও পাপাচারের বিপরীত।

হযরত আদম আ.-এর নিষ্পাপতা সম্পর্কে আলোচনা করা পূর্বে সংক্ষেপে 'নিষ্পাপতা' শব্দের শাব্দিক অর্থ ও তার তাৎপর্য জানা আবশ্যক।

নবীর নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ

বিশ্বজগতের স্রষ্টা মানুষকে পরস্পর বিপরীতমুখী শক্তিসমূহের সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তাকে পাপ ও পুণ্য উভয় প্রকারের শক্তি প্রদান করেছেন। সে পাপও করতে পারে, পুণ্যও করতে পারে। তার মধ্যে খারাপ কাজের ইচ্ছাশক্তি যেমন আছে, তেমনি ভালো কাজের ইচ্ছাশক্তিও আছে। এটাই তার মানবসুলভ মর্যাদার পার্থক্যের প্রতীক। এই বিপরীতমুখী শক্তিসমূহের বাহন মানুষের মধ্য থেকেই আল্লাহ তাআলা মানুষের হেদায়েত ও সত্যপথ প্রদর্শন এবং আল্লাহ পর্যন্ত

[১৭] তাফসিরে ইবনে কাসির : সূরা বাকারা, আয়াত ৩৫; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০।

মানুষকে পৌঁছানোর জন্য কোনো কোনো সময় কোনো মানুষকে নির্বাচন করেন এবং তাঁকে নিজের রাসুল, নবী ও পয়গাম্বর বানিয়ে নেন। এ-শৃঙ্খলেরই সর্বশেষ কড়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এমন ব্যক্তিত্বকে যখন নবুওতের জন্য নির্বাচিত করা হয়, তখন তাঁর ওপর এই দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয় যে, তিনি কার্যকলাপ ও ইচ্ছাশক্তির জীবনে সর্বপ্রকার পাপকাজ থেকে পবিত্র এবং সব ধরনের অবাধ্যাচরণ থেকে নিষ্কলুষ থাকবেন। যাতে আল্লাহ তাআলার পয়গাম বহনের কাজে তিনি আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সুষ্ঠু ও বিশুদ্ধরূপে পালন করতে পারেন এবং— او خویشتن گم است کرا رهبری کند 'সে নিজেই পথভ্রষ্ট, অন্যকে পথ দেখাবে কেমন করে'—এই প্রবাদবাক্যের প্রয়োগক্ষেত্র না হন। এমনিভাবে তিনি (নবী) একজন মানুষ; আর দশজন মানুষের মতো পানাহার করেন, ঘুমান, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট থাকেন। একইসঙ্গে তিনি সব ধরনের কাজ ও ইচ্ছা-সংক্রান্ত পাপ থেকে পবিত্র। কেননা, তিনি সর্বপ্রকার ভালো কাজের প্রতি পথপ্রদর্শক ও উপদেশদাতা এবং আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। যদিও তিনি অবশ্যই অন্যান্য মানুষের মতো বিপরীতমুখী শক্তিসমূহের অধিকারী, কিন্তু কাজে ও ইচ্ছায় তাঁর মাধ্যমে যে-কোনো ধরনের খারাপ কাজ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব করে দেয়া হয়েছে। যাতে তাঁর প্রতিটি ইচ্ছা, প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি কথা—মোটকথা প্রতিটি গতিবিধি বিশ্ববাসীর জন্য আদর্শ ও নমুনা হতে পারে। অবশ্য মানুষ হওয়ার ভিত্তিতে ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং কাদাচিৎ তা কাজেও পরিণত হতে পারে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁকে সতর্ক করে দেয়া হয়। তিনি সাবধানতা অবলম্বন করে তা থেকে দূরে সরে যান।

ভুল-ত্রুটির অর্থ তো খুবই স্পষ্ট; কিন্তু زلة বা لغزش অর্থাৎ পদস্খলন বলতে কী বুঝায়? এই শব্দটি এমন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেখানে কাজকর্মেও কোনো ধরনের অবাধ্যতা বা ঔদ্ধত্যের দখল থাকে না; আর আদেশ লঙ্ঘন করার ইচ্ছা বা সংকল্প তো লেশমাত্র থাকে না। সেই কাজ তার স্বরূপ ও বাস্তবতার বিবেচনায় গর্হিত, মন্দ বা খারাপ না হোক; বরং

এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা মূলগতভাবেই বৈধতা ও জায়েযের পর্যায়ে থাকুক; কিন্তু তারপরও তা সংঘটনকারীর ব্যক্তিত্বের শানের খেলাফ হয় এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদার কাছে হালকা ও তুচ্ছ দৃশ্যমান হয়। তা বৈধ ও জায়েযের শ্রেণীভুক্ত হলেও মহান ব্যক্তির জন্য তা শোভনীয় নয়। এতকিছু সত্ত্বেও এই কাজটি সংঘটিত হয়েছে এ-জন্য যে, সংঘটনকারীর দৃষ্টিতে তাঁর এ-ধরনের কাজ করা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিরোধী ছিলো না। কিন্তু নবীর ওপর যেহেতু আল্লাহর স্বতন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান বিদ্যমান থাকে, তাই তৎক্ষণাৎ তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয় যে এ-ধরনের কাজ তোমার উচ্চ সম্মান ও মহান মর্যাদার জন্য সমীচীন ও সঙ্গত নয় এবং নিশ্চিতভাবে তা অসমীচীন ও অসঙ্গত। মর্যাদার এই পার্থক্যই আরবি ভাষার নিম্নবর্ণিত প্রবাদটিতে ব্যক্ত করা হয়েছে—حسنات الأبرار سيئات المقربين 'নেককার লোকদের সাধারণ নেকির কাজ আল্লাহপাকের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত লোকদের পক্ষে মন্দ কাজ।'

কিন্তু আল্লাহ তাআলার দরবারে সান্নিধ্যপ্রাপ্ত একজন মহামানব আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় বোঝার ব্যাপারে এসব ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্মুখীন হবেন কেনো? এ-জন্য আল্লাহ তাআলার নীতি এই যে, তিনি নবী ও রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) এই জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি তাদের সতর্ক করেন। প্রথমে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে এবং অপরাধমূলক কর্ম হিসেবে সেই ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করেন। কিন্তু তারপর অন্যকোনো ক্ষেত্রে আল্লাহপাক সেই বিষয়টির আসল রূপ প্রকাশ করে দিয়ে নবী ও রাসুলের অনুরূপ কাজকে ত্রুটি-বিচ্যুতির সীমার ভেতরে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে নিজেই ওজর পেশ করে দেন। যাতে কোনো কাফের বা মুনাফিক কোনো নবী ও রাসুলের প্রতি পাপকার্যের দোষারোপ করার সাহস না পায়।

এই তত্ত্বসমষ্টির নামই 'নবীদের নিষ্পাপতা' এবং এটাই ইসলামি আকিদাসমূহের মধ্যে একটি মৌলিক আকিদা। এই মাসআলাটি যদিও আলোচনা ও সমালোচনার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল একটি মাসআলা; কিন্তু দলিল-প্রমাণ, আলোচনা ও গবেষণার পর মাসআলাটির তত্ত্বকথা ও সারমর্ম এটা যা উপরে বর্ণিত হলো এবং এখানে এই পরিমাণই যথেষ্ট।

হযরত আদম আ.-এর নিষ্পাপতা

আম্বিয়ায়ে কেরামের নিষ্পাপতা সম্পর্কে উপরিউক্ত বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর এখন হযরত আদম আ.-এর ঘটনা চিন্তা করুন এবং লক্ষ করুন—কুরআন মাজিদের সুরা বাকারায় ঘটনাটি বর্ণনা করার সময় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরত আদমের এই ভুল পাপজনক ছিলো না, অবাধ্যতামূলকও ছিলো না; বরং অতি সাধারণ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিলো। فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا 'কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো।'

এরপর আল্লাহ তাআলা সুরা আরাফে এবং সুরা তোয়া-হায় দুই জায়গায় ঘটনাটি উদ্ধৃত করে ওয়াসওয়াসা শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন— فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ 'শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিলো।'

আর সুরা তোয়া-হার তৃতীয় স্থানে বিচ্যুতি ও কুমন্ত্রণার কারণ আল্লাহপাক নিজেই ব্যক্ত করে হযরত আদমকে সব ধরনের ইচ্ছা ও কর্ম-সংক্রান্ত পাপ থেকে পবিত্র বলে ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর নিষ্পাপতার বিষয়টিকে অধিকতর দৃঢ় ও শক্তিশালী করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (سورة طه)

'আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম; (আমি আদম থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম) কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নি।' (কিংবা আমি তার অঙ্গীকার পূরণ না করার ব্যাপারে তার ইচ্ছা ও সংকল্পের দখল/সূচনা দেখতে পাই নি। [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ১১৫]

এই আয়াতগুলো পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে যে, হযরত আদম আ. কোনো ধরনের কোনো পাপ করেন নি। ব্যাপার যা ঘটেছে, তাতেও তাঁর ইচ্ছাকৃত আদেশ লঙ্ঘনের কোনো দখল নেই; বরং তা শুধু শয়তানের কুমন্ত্রণাপ্রসূত ছিলো, যা ত্রুটি-বিচ্যুতির আকারে হযরত আদমের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো। তাও আবার ভুলচুকের সঙ্গে।

এসব বিবরণের পর এখন সুরা তোয়া-হার নিম্নবর্ণিত আয়াতটির উদ্দেশ্য আপনা-আপনিই পরিষ্কার হয়ে যায়।

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ

'আদম তার প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করলো, ফলে সে ভ্রান্তিতে পতিত হলো।' (আদম তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করে নি; তাই সে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।) [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ১২১]

আমরা এখানে অবাধ্যাচরণ ও পথভ্রষ্টতার সেই অর্থ গ্রহণ করি নি যা সাধারণ কর্থাবার্তায় গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ পাপাচার ও পথভ্রষ্টতা। বিবেকহীন বা দূরবর্তী ব্যাখার উদ্দেশে এ-ধরনের অর্থ গ্রহণ করা হয় নি; বরং অলঙ্কারশাস্ত্রের ও অভিধানের সাধারণ নিয়মের প্রতি লক্ষ রেখেই এই অর্থ করা হয়েছে। আরবি অভিধানশাস্ত্রের বিখ্যাত 'লিসানুল আরব' ও 'আকরাবুল মাওয়ারিদ' ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে : المعصة مصدر و قد تطلق على الزلة مجازا শব্দটি মাসদার (ক্রিয়ামূল) এবং কখনো রূপক অর্থে তা زلة বা لغزش অর্থাৎ ত্রুটি-বিচ্যুতির অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তেমনিভাবে غَوَىٰ শব্দের অর্থ এখানে ভ্রমে পতিত হয়েছে বা বঞ্চিত হয়েছে।

যাইহোক, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব আয়াতকে এবং ওই আয়াতগুলোকে—যা হযরত আদম আ.-এর উচ্চ মর্যাদা, আল্লাহ তাআলার খাঁটি ও মনোনীত বান্দা হওয়া এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব লাভ ইত্যাদি বিষয় প্রকাশ করছে—ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা ঠিক হবে না। এটা অভিযোগ উত্থাপনকারীদের সাধারণ নিয়ম এবং তা অধিকাংশ সময় কুরআন মাজিদের মর্মার্থ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির কারণ হয়ে থাকে। বরং সংশ্লিষ্ট সমস্ত আয়াতকে একত্র করে অনুধাবন করা উচিত। সুতরাং এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো যে হযরত আদম আ.-এর নিষ্পাপতার মাসআলাটি একটি অনস্বীকার্য সত্য এবং এতে কোনো ধরনের সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ নেই।

আর যদি عصى এবং غوى শব্দ দুটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মেনে নেয়া হয়, তারপরও ওই মূলনীতিগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক যা 'আম্বিয়ায়ে কেরামের নিষ্পাপতা'-এর স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তা হলো, কুরআন মাজিদের আয়াতগুলো এ-কথা প্রকাশ করছে যে আদম আ. নবী ছিলেন; আল্লাহ তাআলার খাঁটি বন্ধু ও মনোনীত বান্দা ছিলেন এবং আল্লাহপাকের প্রতিনিধিরূপে মহান মর্যাদার

অধিকারী ছিলেন। তাই এই আয়াতগুলোতে তাঁর এই ত্রুটিবিচ্যুতিকে এতো কঠোর ভাষায় এ-জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আদম আ.-এর মতো আল্লাহর দরবারে সান্নিধ্যপ্রাপ্ত একজন মহামানবের পক্ষে—যিনি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করার সম্মান অর্জন করেছেন—এই বিচ্যুতি ও ভুলও তাঁর মর্যাদা হানিকর এবং তাঁর জন্য অসঙ্গত। এ-জন্য তিনি অত্যধিক পাকড়াও হওয়ার যোগ্য, যদিও সৎ ও নেককার মানুষের পক্ষে এ-ধরনের একটি ভুল অতি সাধারণ বিষয়ই হোক না কেনো।

নয়. হযরত আদম আ. মানবজগতে আদিমানব এবং মানবজাতির আদিপিতা না-কি তাঁরও পূর্বে এই বিশ্বজগতে এক ধরনের মানবজগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিলো এবং সেই মানবজাতির জন্য একজন আদম—আদিপিতা ছিলেন?

এ-বিষয় সম্পর্কে কোনো কোনো ভূতত্ত্ববিদ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, বর্তমান মানবজগতের পূর্বেও এই আবাদ অংশের ওপর মানবজগতের অস্তিত্ব ছিলো। আজ থেকে তিরিশ হাজার বছর পূর্বের ওই মানবজাতির নাম ছিলো 'তিয়ানদারতাল'। বর্তমান মানববংশের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না; বরং তারা ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বংশ, যা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। এরপর বর্তমান মানববংশ জন্মলাভ করেছে। কিন্তু তাঁদের এই তত্ত্বোদ্‌ঘাটন অনুমাননির্ভর ও ধারণাপ্রসূত। মানুষের অবয়ব ও অস্থিসমূহের গবেষণা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কোনো প্রকৃত জ্ঞান ও বিশ্বাসের ওপর এই ধারণার ভিত্তি স্থাপিত হয় নি। আর কুরআন মাজিদ আমাদেরকে এ-বিষয়ে কোনো সন্ধান প্রদান করে নি। কোনো স্থানে এ-বিষয়ের প্রতি একটু ইঙ্গিতও করে নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ-বিষয়টির ওপর কোনো আলোকপাত করেন নি। সুতরাং যে-একিনি ও বিশ্বাসদৃপ্ত ইলম আমরা কুরআন মাজিদ থেকে এবং আল্লাহর সুস্পষ্ট ওহির সংবাদ প্রদানে লাভ করেছি তাই আমাদের একিন ও বিশ্বাসের জন্য যথেষ্ট।

আসল এ-ধরনের জ্ঞানগত আলোচনার জন্য ইসলামের শিক্ষা এই যে, যেসব বিষয় একিনি ইলম ও চাক্ষুষ দর্শনের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, অথচ কুরআন থেকে লব্ধ ইলম এবং আল্লাহ তাআলার ওহি সেসব বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করে না—কেননা কুরআন মাজিদ চাক্ষুষ দর্শন

ও স্পষ্ট বিষয়কে কখনো অস্বীকার করে না—তবে নিঃসন্দেহে তা মেনে নেয়া উচিত। কারণ, এ-ধরনের সত্য বিষয় অস্বীকার করা অন্যায় একগুঁয়েমি এবং দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে যেসব বিষয় এখনো পর্যন্ত একিন ও দৃঢ় বিশ্বাসের সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে নি, যাকে চাক্ষুষ দর্শন বা স্পষ্ট প্রকাশ বলা যেতে পারে, যেমন এখানকার আলোচ্য বিষয়, তাহলে সে-সম্পর্কে কুরআনের মর্মার্থে কোনো অপব্যাখ্যা করা উচিত নয়। তা ছাড়া অনর্থকভাবে সেসব মর্মার্থকে নতুন ধরনের যুক্তি ও তথ্যের ছাঁচে ঢালা কখনোই জায়েয নয়। বরং সময়ের অপেক্ষা করা উচিত, যাতে উক্ত বিষয়গুলো নিজেদের স্বরূপ এমনভাবে প্রকাশ করে দেয় যে তাদেরকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করলে চাক্ষুষ ও প্রকাশ্য বিষয়কে অস্বীকার করা অবধারিত হয়। কারণ, এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে, ইলমি বা জ্ঞানগত আলোচনাকে তো বারবার স্থানান্তরিত হতে হয়; কিন্তু কুরআন থেকে লব্ধ ইলমকে কখনো তার স্থান থেকে একবারও নড়তে হয় নি। আর যখনই ইলমি আলোচ্য বিষয়গুলো আলোচনা ও গবেষণার পর একিন ও চাক্ষুষ দর্শনের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে, তখনো তা ওই সীমা থেকে এক বিন্দুও সামনে অগ্রসর হয় নি যা পবিত্র কুরআন আগেভাগেই পরিষ্কার করে দিয়েছে।

অবশ্য যদি কোনো মুফাস্‌সির একটি আয়াতের এমন তাফসির করে দেন যা উক্ত বিষয়ের আসল স্বরূপের বিপরীত হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর বর্ণিত অর্থকে ত্যাগ করা এবং কুরআনের আয়াতকে আসল স্বরূপ অনুযায়ী প্রকাশ করা কুরআন মাজিদের দাবি। أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ - أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ 'তোমরা কি বুঝতে চেষ্টা করো না?' 'তারা কি চিন্তা-গবেষণা করে না?' 'তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?' বাক্যগুলো দ্বারা বারবার চেষ্টা ও চিন্তা করার আহ্বান করার মধ্যে সেই দাবিই প্রকাশ পাচ্ছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, এই আলোচনা শুধু ওইসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা ঐতিহাসিক, ভৌগলিক এবং প্রাকৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ততা রাখে। কুরআন মাজিদ ওইসব বিষয়ে ততটুকুই লক্ষ করেছে যার দ্বারা হেদায়েত ও নসিহতের উদ্দেশ্যে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওইসব বিষয়ে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অবকাশ নেই, যা একজন মুসলমানের মুসলমান হওয়া এবং

তার আকিদা ও আমলের প্রেক্ষিতে তার 'মুমিন' নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং কুরআন মাজিদ সেসব বিষয়কে যে-একিন ও প্রকৃত জ্ঞান (আল্লাহর ওহি) দ্বারা বর্ণনা করে দিয়েছে তার মধ্যে আদৌ কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার অবকাশ নেই। তা ছাড়া তা কোনো তত্ত্বানুসন্ধান এবং গবেষণারও মুখাপেক্ষী নয়। যেমন : আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, পরলোকের অস্তিত্ব, আল্লাহর ফেরেশতাগণ, তাকদির, নবী ও রাসুলগণের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস, কিংবা নামায ও রোযার প্রকৃত সত্য (মূল হাকিকত), হজ ও যাকাতের মর্মার্থ ইত্যাদি। এসব বিষয় কোনো মুসলমানের নতুনভাবে তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণার মুখাপেক্ষী নয়; বরং এসবকিছুর হাকিকত সম্পর্কে কুরআন মাজিদের আয়াত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসসমূহ আমাদেরকে সবকিছু থেকে নিশ্চিতভাবে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। আর কুরআন ও হাদিসের প্রদত্ত ইলমের ভিত্তি একিনি ইলম অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ওহির ওপর স্থাপিত। যা অবিনশ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয়।

দশ. এই ঘটনাটি সম্পর্কে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবদুটিতে যেসব কিচ্ছা-কাহিনি বিবৃত হয়েছে যেমন সাপ ও ময়ূরের কাহিনি এবং এ-জাতীয় অন্যান্য কাহিনি যা কুরআন মাজিদ ও অন্যান্য সহিহ রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় না, এগুলো সম্পর্কে প্রকৃত নির্দেশ কী?

এসব ঘটনাবলিকে ইসরাইলি অর্থাৎ ইহুদিদের মনগড়া রেওয়ায়েত বলা হয়। এ-ধরনের যাবতীয় রেওয়ায়েত ভিত্তিহীন। এই ঘটনাগুলোর পেছনে একিনি ইলম এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান (ইলমে ওহি)-এর সনদ নেই এবং যুক্তি বিবেক ও ইতিহাসের সাক্ষ্যও নেই। সুতরাং এগুলো মনগড়া ও ভিত্তি কথা। কোনো কোনো মুফাস্সিরও এ-ধরনের রেওয়ায়েতসমূহ উদ্ধৃত করতে তথ্যানুসন্ধানে শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকেন। এতে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়। কেবল সাধারণ মানুষ নয়, বরং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও মনে করতে থাকেন যে এই রেওয়ায়েতগুলো ইসলামি রেওয়ায়েতের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোও সহিহ রেওয়ায়েতগুলোর মতো গ্রহণযোগ্য। সুতরাং ইসরাইলি রেওয়াতের সম্পর্কে নির্দেশ হলো, রদ করা বা খণ্ডন করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কুরআন মাজিদের তাফসিরে এসব রেওয়ায়েতকে স্থানই দেয়া না হয়। আর তাফসির ও হাদিসের কিতাবই নয়, জীবনচরিত ও

ইতিহাসের গ্রন্থগুলোকেও এসব মনগড়া রেওয়ায়েত থেকে পবিত্র রাখা একান্ত আবশ্যক।

এগার. হযরত আদম আ.-এর ঘটনায় ملك বা ফেরেশতা এবং জিন-এর উল্লেখ রয়েছে। এরা কি আল্লাহ তাআলার পৃথক পৃথক দুই ধরনের মাখলুক না দুই ধরনের শক্তির নাম, যা ফেরেশতা শক্তি এবং শয়তানি শক্তি নামে অভিহিত।

ফেরেশতা

কুরআন মাজিদে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক হাদিসে যা-কিছু আমরা পেয়েছি তার সারমর্ম এই : আমাদেরকে ফেরেশতাজাতির সৃষ্টিতত্ত্ব জানানো হয় নি এবং ফেরেশতারা আমাদের দৃষ্টিগোচরও হন না। অবশ্য আমাদের জন্য এই বিশ্বাস ও আকিদা রাখা জরুরি সাব্যস্ত করা হয়েছে যে আমরা ফেরেশতাদের অস্তিত্ব মেনে নেবো এবং তাঁদেরকে স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করবো। কেননা, কুরআন মাজিদ এবং সহিহ হাদিসসমূহ ফেরেশতাদের কয়েকজনের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেছে। তা ছাড়া ফেরেশতাজাতির যেসব গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে ফেরেশতারা স্বতন্ত্র সৃষ্টি। নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলোতে ফেরেশতাদের স্বরূপ ব্যক্ত করা হয়েছে—

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ () مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (سورة البقرة)

'বলো, "যে-কেউ জিবরিলের শত্রু (হয় হোক) এইজন্য যে সে আল্লাহর নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ"— যে-কেউ আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাগণের, তাঁর রাসুলগণের এবং জিবরিল ও মিকাইলের শত্রু (হয়), তারা জেনে রাখুক (তারা কাফের), আল্লাহ নিশ্চয় কাফেরদের শত্রু।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৯৭-৯৮]

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (سورة النحل)

'তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশ ওহি[১৮]সহ ফেরেশতা প্রেরণ করেন এই বলে যে, তোমরা সতর্ক করো যে নিশ্চয় আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই; সুতরাং আমাকে ভয় করো।' [সুরা নাহল : আয়াত ২]

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই যিনি বাণীবাহক (তাঁর পয়গাম বহনকারী) করেন ফেরেশতাদেরকে যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' [সুরা ফাতির : আয়াত ১]

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

'ফেরেশতা এবং রুহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে যার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছর।' [সুরা মাআরিজ : আয়াত ৪]

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

'ফেরেশতাগণ (কিয়ামতের দিন) আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেইদিন আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের ঊর্ধ্বে।' [সুরা হাক্কাহ : আয়াত ১৭]

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, "আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি", তারা বললো, "আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।"[১৯] তিনি বললেন, "আমি জানি যা তোমরা জানো না।" [সুরা বাকারা : আয়াত ৩০]

এই আয়াতগুলো পাঠ করার পর আপনি নিজেই বিচার করুন— যেসব খোদাদ্রোহী মানুষ ফেরেশতাদের স্বতন্ত্র সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার

---

[১৮] الرُّوح অর্থ এখানে ওহি বা কুরআন।

[১৯] খলিফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী তা জানার জন্য ফেরেশতাগণ এ-কথা বলেছিলেন।

করেছে . এ-ব্যাপারে তাদের অপব্যাখ্যাসমূহ এবং কুরআন মাজিদের বিকৃত সাধন কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

কুরআন মাজিদের ৮৬ টি আয়াতে ৮৮ বার ফেরেশতাদের উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত ছকটিতে তা প্রদর্শিত হলো।

সুরা	সুরার নাম	আয়াত
২	সুরা আল-বাকারা	৩০, ৩১, ৩৪, ৯৮, ১০২, ১৬১, ১৭৭, ২১০, ২৪৮, ২৮৫
৩	সুরা আলে ইমরান	১৮, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৮০, ৮৭ ১২৪, ১২৫
৪	সুরা আন-নিসা	৯৭, ১৩৬, ১৬৬, ১৭২
৬	সুরা আল-আন'আম	৮, ৯, ৫০, ৯৩, ১১১, ১৯৮
৭	সুরা আল-আ'রাফ	১১, ২০
৮	সুরা আল-আনফাল	৯, ১২, ৫০
১১	সুরা হুদ	১২, ১৩
১২	সুরা ইউসুফ	৩১
১৩	সুরা আর-রাদ	১৩, ২৩
১৫	সুরা আল হিজর	৭, ৮, ২৮, ৩০
১৬	সুরা আন-নাহল	২, ২৮, ৩২, ৩৩, ৪৯
১৭	সুরা আল-ইসরা	৪০, ৬১, ৯২, ৯৫
১৮	সুরা আল-কাহফ	৫০
২০	সুরা তোয়া-হা	১১৬
২১	সুরা আল-আম্বিয়া	১০৩
২২	সুরা আল-হাজ	৭৫
২৩	সুরা আল-মুমিনুন	২৪
২৫	সুরা আল-ফুরকান	৭, ২১, ২২, ২৫
৩২	সুরা আস-সাজদা	১১
৩৩	সুরা আল-আহযাব	৪৩, ৫৬
৩৪	সুরা সাবা	৪০
৩৫	সুরা ফাতির	৩৫
৩৭	সুরা আস-সাফফাত	১৮৯
৩৮	সুরা সোয়াদ	৭১, ৭৩

৩৯	সূরা আয-যুমার	৭৫
৪১	সূরা হা-মীম আস-সাজদা	১৪
৪২	সূরা আশ-শুরা	৫
৪৩	সূরা আয-যুখরুফ	১৯, ৫৩, ৬০
৪৭	সূরা মুহাম্মদ সা.	২৭
৫৩	সূরা আন-নাজম	২৬, ২৭
৬৬	সূরা আত-তাহরিম	৬৪
৬৯	সূরা আল-হাক্কাহ	১৭
৭০	সূরা আল-মাআরিজ	৪
৭৪	সূরা আল-মুদ্দাস্সির	৩১
৭৮	সূরা আন-নাবা	৩৮
৮৯	সূরা আল-ফাজর	২২
৯৭	সূরা আল-কাদর	৪

তা ছাড়া সহিহ হাদিসসমূহে এবং তাওরাত, ইঞ্জিল, জাবুর ইত্যাদি প্রাচীন আসমানি গ্রন্থসমূহেও ফেরেশতাদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদেরকে স্বতন্ত্র সৃষ্টিই বলা হয়েছে। বিশেষ করে সহিহুল বুখারি ও সহিহু মুসলিম-এর এ-বক্তব্যে অধিক প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

জিন

এমনিভাবে জিনও আল্লাহর একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এই জাতির সৃষ্টি সম্পর্কেও আমরা পরিপূর্ণভাবে অবগত নই। আর সাধারণ মানুষের বসতির মতো জিনজাতি আমাদের দৃষ্টিগোচরও হয় না। কিন্তু জিনজাতির সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন মাজিদ আমাদেরকে যে-বর্ণনা ও তথ্য প্রদান করেছে তাতে আমরা এই বিশ্বাস ও আকিদা রাখতে বাধ্য যে, জিনজাতিও মানুষের মতো একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি এবং মানুষের মতোই শরিয়তের বিধি-বিধানের দায়িত্ব-অর্পিত। তাদের মধ্যে বংশবৃদ্ধির প্রথাও রয়েছে। তাদের নেককার ও বদকার অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ ও পাপাচারীও আছে। কুরআন মাজিদের নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহ উল্লিখিত তথ্যাবলিকেই বিশদ ও স্পষ্ট করছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এইজন্য যে তারা আমারই ইবাদত করবে।' (তাদেরকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।) [সুরা যা'রিয়াত : আয়াত ৫৬]

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (سورة الأعراف)

'সে নিজে এবং তার দল (তার সাঙ্গপাঙ্গরা) তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ২৭]

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا () يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (سورة الجن)

'বলো, "আমার প্রতি ওহি প্রেরিত হয়েছে যে জিনদের একটি দল মনোযোগসহ (আমার কুরআনপাঠ) শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি,[২০] যা সঠিক পথনির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরিক স্থির করবো না।' [সুরা জিন : আয়াত ১-২]

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

'আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালঙ্ঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বেছে নেয়।' [সুরা জিন : আয়াত ১৪]

এসব আয়াত থেকে এ-কথা বুঝা যায় যে শয়তান জিনেরই বংশধর। আর ইবলিস (শয়তান) আল্লাহ তাআলার সামনেই নিজেই এ-কথা স্বীকার করেছে যে তাদেরকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। উপরিউক্ত আয়াতগুলো ছাড়াও জিন, জান্ন ও জিন্নাতুন শব্দগুলো ৩১ টি আয়াতে ৩২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত ছকে তা প্রদর্শিত হলো।

সুরা	সুরার নাম	আয়াত
৬	সুরা আল-আন'আম	১০০, ১১২, ১২৮, ১৩০
৭	সুরা আল-আ'রাফ	৩৮, ১৯৭
১১	সুরা হুদ	১১৯
১৫	সুরা আল হিজর	২৭
১৭	সুরা আল-ইসরা	৮৮

[২০] জিনের একটি দল কুরআন শুনে তাদের সঙ্গীদেরকে এই কথাগুলো বলেছিলো।

১৮	সুরা আল-কাহফ	৫০
২৭	সুরা আন-নামল	১৭, ৩৯
৩২	সুরা আস-সাজদা	১৩
৩৪	সুরা সাবা	১২, ১৪, ৪১
৩৭	সুরা আস-সাফ্‌ফাত	১৫৮
৪১	সুরা হা-মীম আস-সাজদা	২৫, ২৬
৪৬	সুরা আল-আহকাফ	১৮, ২৯
৫১	সুরা আয-যারিয়াত	৫৬
৫৫	সুরা আর-রহমান	১৫, ২৩, ৩৯, ৫৬, ৭৪
৭২	সুরা আল-জিন্ন	১, ৫, ৬
১১৪	সুরা আন-নাস	৬

সারকথা হলো, কুরআন মাজিদ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এই সংবাদ প্রদান করেছেন যে ফেরেশতা এবং জিন আমাদের কাছে অদৃশ্য হলেও নিঃসন্দেহে তারা স্বতন্ত্র মাখলুক। আর এটা সত্য যে চাক্ষুষ দর্শনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বার বার ভুল হতেও দেখা যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ওহি এবং পবিত্র ও নিষ্পাপ নবী আলাইহিস সালাম-এর সংবাদ প্রদানে একেবারেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আমাদের আকিদা ও বিশ্বাস এই যে তারা আল্লাহ তাআলার স্বতন্ত্র সৃষ্টি। তা ছাড়া যুক্তির দিক থেকেও তারা স্বতন্ত্র জাতি হওয়া অসম্ভব নয়। বরং তা যুক্তিগত সীমানার মধ্যেই রয়েছে।

সুতরাং যে-বিষয়টি বিবেক ও বুদ্ধির কাছে অসম্ভব বলে বিবেচিত হয় না এবং যা আল্লাহর ওহির সুদৃঢ় প্রমাণ রয়েছে তা অস্বীকার করা ইলম ও প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করারই নামান্তর এবং তা চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এবং হটকারিতারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আর তারা যে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও অনুভব-উপলব্ধির বাইরে এবং তাদেরকে যে আমরা দেখতে পারি না তাও তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো যৌক্তিক প্রমাণ হতে পারে না। তা এ-জন্য যে আধুনিক যুগের অনুবীক্ষণযন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হওয়ার আগে হাজার হাজার বছর ধরে আমরা অনেক বস্তু দেখতে পেতাম না বা অনুভব করতে পারতাম না, যদিও তাদের অস্তিত্ব সে-সময়েও বিদ্যমান ছিলো। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেসব বস্তু আমরা

দেখতেও পারি, অনুভবও করতে পারি। সুতরাং হাজার বছর আগে যেসব মানুষ এসব বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো তা কি কোনো প্রকৃত জ্ঞানভিত্তিক ছিলো না জ্ঞানগত ত্রুটি, অনুসন্ধান ও গবেষণার উপায় সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল ছিলো? এমনিভাবে আমরা আজো বিদ্যুৎ, চুম্বক আলোর প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারি নি; তাদেরকে আমরা কেবল ক্রিয়া ও দর্শনের মধ্য দিয়েই বুঝে থাকি।

এমনিভাবে খোদাদ্রোহীদের অবিশ্বাস ও অস্বীকৃতি কোনো ইলম বা একিন (প্রকৃত জ্ঞান ও বিশ্বাস) ভিত্তিক নয়; বরং অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের আওতায় না আসার কারণে অজ্ঞতাবশত তারা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে থাকে। এটা কখনো এবং কোনোভাবেই অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ হতে পারে না। তা ছাড়া জ্ঞান দুইভাবেই অর্জিত হতে পারে : একটি হলো বিভিন্ন বিষয় ও শাস্ত্রের মাধ্যমে, যার অর্জন শিক্ষা ও শ্রমসাধ্য আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ তাআলা দান করলেও জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। এর সর্বোচ্চ স্তর আল্লাহ তাআলার ওহি। সুতরাং আমরা যদি আমাদের জ্ঞান ও শাস্ত্রের মাধ্যমে জানতে না পারি; কিন্তু বুদ্ধি ও বিবেক তার অস্তিত্বকে অসম্ভব মনে না করে এবং আল্লাহর ওহি তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে প্রত্যেক বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরয) যে, আমাদের জ্ঞান ও শাস্ত্রের অক্ষমতা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নেওয়া এবং বিশ্বাস স্থাপন করা। অবশ্য কেউ যদি ওই সাক্ষ্য ও সংবাদ প্রদানকে ওহিই মনে না করে অথবা আল্লাহর ওহিরই অস্বীকারকারী হয় তবে সে-ব্যক্তির জন্য এই সাক্ষ্য ও সংবাদের ওপর ঈমান আনার আগে ওইসব প্রমাণ দেখে নেয়া আবশ্যক যা কুরআন মাজিদ এ-সম্পর্কে বর্ণনা করেছে এবং বলা হয়েছে যে তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর ওহি।

আদম আ.-এর ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

এমনিই তো আদম আ.-এর ঘটনায় অসংখ্য উপদেশ ও মাসআলার সমাবেশ ঘটেছে। এখানে তার সবকয়টির বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। তারপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশের প্রতি ইঙ্গিত করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

এক. আল্লাহ তাআলার হেকমতসমূহের রহস্য অসংখ্য ও অগণিত। কোনো মানুষের পক্ষে—তিনি আল্লাহর যত বেশি সান্নিধ্যপ্রাপ্তই হোন না কেনো—সেইসব রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া কখনোই সম্ভবপর নয়। এ-কারণেই আল্লাহর ফেরেশতাগণ চূড়ান্ত পর্যায়ের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আদম আ.-কে খলিফা বানানোর হেকমত সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন নি এবং বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সামনে না আসা পর্যন্ত বিস্ময়ে মগ্ন ছিলেন।

দুই. আল্লাহর তাআলার অনুগ্রহ ও মনোযোগ যদি কোনো তুচ্ছ বস্তুর প্রতিও নিবদ্ধ হয় তবে তা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম এবং মহা সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং মহত্ত্ব ও মর্যাদা লাভ করতে পারে।
এক মুষ্টি মাটির প্রতি লক্ষ করুন এবং তারপর আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্বের পদটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাঁর নবুওত ও রেসালাতের পদরির (নবী ও রাসুল হওয়া) প্রতিও লক্ষ করুন। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ ও মনোযোগ ভাগ্য ও ঘটনাক্রমে হয় না এবং তা হেকমতশূন্যভাবেও হয় না। বরং তা সেই বস্তুর যোগ্যতা অনুসারে দৃষ্টান্তহীন হেকমত ও কল্যাণকামিতার সূত্রে গ্রথিত হয়ে থাকে।

তিন. মানুষকে সব ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে এবং সে সব ধরনের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে। তারপরও তার সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত দুর্বলতা তার জায়গায় আগের মতোই বহাল তবিয়তে আছে এবং তারপরও মানব ও মনুষ্যসুলভ সৃষ্টিগত ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে। এই দুর্বলতা ও ত্রুটিই ছিলো সেই বস্তু যা আদম আ.-এর ওপর উচ্চপদ ও উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও ভুল আনয়ন করেছিলো এবং তিনি শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়েছিলেন।

চার. অপরাধী হয়েও মানুষের অন্তর যদি তওবা ও অনুতাপের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তবে তার জন্য আল্লাহ তাআলার রহমতের দ্বার রুদ্ধ নয় এবং সেই দরবার পর্যন্ত পৌঁছার পথে নৈরাশ্যের কোনো ঘাঁটিও নেই। অবশ্য সত্যিকারের অনুতাপ এবং একনিষ্ঠ তওবা হওয়া শর্ত। হযরত আদম আ.-এর ভুলত্রুটি যেমন এই তওবা ও অনুতাপের ফলে মার্জনা লাভ

করেছে, তেমনি তাঁর বংশধরদের জন্য ক্ষমা ও রহমতের জগৎ খুবই প্রশস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'বলো, (আপনি লোকদেরকে বলে দিন, আল্লাহ তাআলা বলছেন,) "হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো (অর্থাৎ পাপাচার করে নিজের প্রতি জুলুম করেছো)—আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে না; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। (তোমরা কেবল তওবা ও অনুতাপের সঙ্গে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করো।) তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সুরা যুমার : আয়াত ৫৩]

পাঁচ. আল্লাহর দরবারে বেয়াদবি ও বিদ্রোহ করা বড়ো থেকে বড়ো পুণ্য ও সৎকাজকে ধ্বংস করে দেয় এবং তার চিরস্থায়ী ধ্বংস ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ-বিষয়ে ইবলিসের ঘটনাটি অত্যন্ত শিক্ষামূলক ঘটনা। আল্লাহ তালাআর দরবারে বেয়াদবি ও বিদ্রোহ করার ফলে ইবলিসের হাজার বছরের ইবাদতের কী দুর্দশা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে লক্ষ লক্ষ উপদেশ গ্রহণের উপকরণ।

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

'অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।' [সুরা হাশর : আয়াত ২]

কাবিল ও হাবিল

এই দুজনের ঘটনাও যেহেতু হযরত আদম আ.-এর ঘটনারই অংশবিশেষ, তাই এখানে তা উল্লেখযোগ্য।

কুরআন মাজিদ হযরত আদম আ.-এর দুই পুত্রের নাম উল্লেখ করে নি, শুধু ابْنَيْ آدَمَ বলেই শেষ করেছে। অবশ্য তাওরাতে তাদের এই নামই বর্ণিত হয়েছে যা শিরোনামে বলা হয়েছে। হাবিল ও কাবিলের ঘটনা সম্পর্কে হাদিসের হাফেজ ইমামুদ্দিন ইবনে কাসির তাঁর ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় ইমাম সুদ্দির সনদের সঙ্গে একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। রেওয়ায়েতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

মাসউদ রা. এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে। তার বিষয়বস্তু হলো এই, মানবজগতের বংশবৃদ্ধির জন্য হযরত আদম আ.-এর নিয়ম ছিলো যে হযরত হাওয়ার একবারের গর্ভজাত জমজ ছেলে ও মেয়েকে অন্যবারের গর্ভজাত ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দিতেন। এই নিয়ম অনুযায়ী হাবিল ও কাবিলের বিয়ের বিষয়টিও সামনে ছিলো। কাবিল বয়সে বড় ছিলো এবং তার বোন হাবিলের বোনের চেয়ে বেশি সুন্দরী ছিলো। এ-কারণে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী হাবিলের বোনকে বিবাহ করতে এবং নিজের বোনকে হাবিলের কাছে বিয়ে দিতে কাবিল খুবই অনিচ্ছুক ছিলো। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য হযরত আদম আ. এই সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন যে তারা উভয়ে আল্লাহর দরবারে কুরবানি পেশ করবে। যার কুরবানি কবুল হবে সেই নিজের ইচ্ছা পূরণ অধিকার পাবে।

তাওরাতে দেখা যায়, সে-কালে কুরবানি ও মানত কবুল হওয়ার ইলহামি দস্তুর ছিলো। তা হলো, মানত ও কুরবানির বস্তু কোনো উঁচু জায়গার ওপর রেখে দেয়া হতো। তারপর আসমান থেকে আগুন এসে কবুলকৃত বস্তুটিকে পুড়িয়ে দিতো। এই নিয়ম অনুযায়ী হাবিল নিজের পাল থেকে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা আল্লাহর নামে কুরবানি করলেন। ওদিকে কাবিল নিজের শস্যভাণ্ডার থেকে নিকৃষ্ট ধরনের কিছু শস্য কুরবানির জন্য পেশ করলো। এতেই উভয়ের নেক নিয়ত ও বদ নিয়তের নমুনা পাওয়া গেলো। ফলে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আগুন এসে হাবিলের কুরবানিকে পুড়িয়ে ফেললো এবং কুরবানি কবুল হওয়ার সম্মান তিনিই লাভ করলেন। কাবিল নিজের এই অপমান কোনোভাবেই সহ্য করতে পারলো না। সে ক্রুদ্ধ হয়ে হাবিলকে বললো, আমি তোমাকে হত্যা না করে ছাড়বো না, যাতে তোমার উদ্দেশ্য সফল না হয়। হাবিল তার জবাবে বললেন, আমি তো কোনোক্রমেই তোমার ওপর হাত তুলবো না। তোমার যা ইচ্ছা হয় করো। কুরবানির ব্যাপারটি এমন যে নেক নিয়তের কুরবানিই আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়ে থাকে। এ-ক্ষেত্রে বদ নিয়তওয়ালার হুমকি কোনো কাজে আসে না এবং বিনা কারণে রাগ ও ক্রোধও কোনো সফলতা আনতে পারে না। কাবিলের ওপর এই উপদেশের বিপরীত ফল হলো এবং সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নিজের ভাই হাবিলকে হত্যা করে ফেললো।

কিন্তু কুরআন মাজিদে বিয়ের বিষয়টি উল্লেখ করা হয় নি। শুধু কুরবানির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। আর উপরিউক্ত রেওয়ায়েতটি থেকে হাবিলের মৃতদেহ সম্পর্কে নিচের কথাগুলো অতিরিক্ত আছে।

হাবিলকে হত্যা করার পর কাবিল অস্থির হয়ে পড়লো যে এখন এই মৃতদেহটি নিয়ে সে কী করবে? এখন পর্যন্ত আদম সন্তানেরা মৃত্যু দেখে নি। তাই হযরত আদম আ. মৃতদেহ সম্পর্কে আল্লাহর কোনো বিধান তাঁর সন্তানদেরকে শোনান নি। অকস্মাৎ কাবিল দেখতে পেলো একটি কাক মাটি খুঁড়ে গর্ত করছে। তা থেকে কাবিল বুঝতে পারলো যে আমার ভাইয়ের জন্য এভাবে গর্ত খনন করা উচিত। অন্য একটি রেওয়ায়েতে দেখা যায় যে কাকটি গর্ত খুঁড়ে অন্য একটি মৃত কাককে সেই গর্তের মধ্যে ঢেকে রাখলো। কাবিল তা দেখে নিজের অযোগ্য জীবনের জন্য আফসোস করলো এবং বলতে লাগলো, আমি এই তুচ্ছ প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট হলাম। নিজের এই অপরাধকে গোপন করার যোগ্যতাও আমার নেই। যে অনুতাপে তার মাথা হেঁট করলো। তারপর সেভাবেই নিজের ভাইয়ের মৃতদেহ মাটির নিচে চাপা দিয়ে রাখলো। কুরআন মাজিদে তার বর্ণনা এই—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ () لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ () إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ () فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ () فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ () مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (سورة المائدة)

'আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিল) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও। যখন তারা উভয়ে কুরবানি করেছিলো (আল্লাহর

দরবারে কুরবানির বস্তু পেশ করেছিলো।) তখন একজনের কুরবানি কবুল হলো এবং অন্যজনের (কুরবানি) কবুল হলো না। (যার কুরবানি কবুল হলো না) সে বললো, "আমি তোমাকে হত্যা করবোই।" অপরজন বললো, "অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানি কবুল করেন। আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলবো না; আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালককে ভয় করি। আমি চাই যে তুমি (এই বাড়াবাড়ির কারণে) আমার ও তোমার পাপের ভার বহন করো এবং অগ্নিবাসী হও এবং এটা জালিমদের কর্মফল।" এরপর তার চিত্ত তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উত্তেজিত করলো। ফলে সে তাকে হত্যা করলো; তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের মৃতদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগলো। (কীভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ ঢাকবে। তা দেখে) সে বললো, "হায়! আমি কি এই কাকের মতো হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ গোপন করতে পারি?" তখন সে অনুতপ্ত হলো। (আল্লাহ তাআলা বলেন,) এ-কারণেই বনি ইসরাইলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেনো দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো,[২১] আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেনো সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো। তাদের কাছে তো আমার রাসুলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিলেন; কিন্তু তারপরও তাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালঙ্ঘনকারীই রয়ে গেলো।' [সুরা মায়িদা : আয়াত ২৭-৩২]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. তাঁর মুসনাদ কিতাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে নিম্নলিখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন—

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن مسعود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে-কোনো মানুষকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হোক না কেনো তার খুনের (পাপের) একটি অংশ প্রথম হত্যাকারী আদমের সন্তানের (কাবিলের ঘাড়ের) ওপর বর্তাবে; কেননা, সেই প্রথম

---

[২১] অন্যায় হত্যার মন্দ পরিণতির কারণে।

হত্যার প্রচলন করেছে।'[২২] (অন্যায়ভাবে হত্যা শুরু করে তার অপবিত্র প্রথার প্রবর্তন করেছে।)

দামেশক শহরের উত্তর দিকে কাসিয়ুন পাহাড়ের ওপর একটি মাজার নির্মিত রয়েছে। তা হাবিলের নিহত হওয়ার স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ-সম্পর্কে ইবনে আসাকির[২৩] রহ. আহমদ বিন কাসিরের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন। তাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। নবীজির সঙ্গে হাবিলও ছিলেন। হাবিল কসম করে বললেন, এটাই আমার নিহত হওয়ার স্থান। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে-কথার সত্যায়ন করলেন। যাইহোক, তা স্বপ্নেরই কথা। স্বপ্ন সত্য হলেও তা দ্বারা শরিয়তের বা ইতিহাসের কোনো নির্দেশ সাব্যস্ত হতে পারে না।

শিক্ষাগ্রহণের স্থান

সুরা মায়েদার শেষ এবং উপরিউক্ত হাদিসটি আমাদের জন্য এই তথ্য উন্মোচিত করছে যে মানুষের পক্ষে তার জীবনে নতুন কোনো পাপের প্রবর্তন করা উচিত নয়। যাতে তা ভবিষ্যতে অসৎপরায়ণ ও জালিম লোকদের জন্য একটি নতুন অস্ত্র না হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় তার ফল দাঁড়াবে এই, পৃথিবীর যে-কোনো ব্যক্তিই নতুন প্রবর্তিত পাপের কাজটি করবে, এই নতুন পাপের প্রবর্তকও সবসময় এই গুনাহের অংশীদার হতে থাকবে। আর পাপের প্রবর্তক হওয়ার কারণে সবসময় সে লাঞ্ছনা ও ক্ষতির শিকার থাকবে। পাপ সর্বদাই পাপ। কিন্তু তা পাপের প্রবর্তকের জন্য চিরকালীন দুর্ভোগ তার মাথার সঙ্গে বেঁধে দেয়।

يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي

"হায়! আমি কি এই কাকের মতো হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ গোপন করতে পারি?" (আমরা আল্লাহর কাছে তা থেকে পানাহ চাই।)

---

[২২] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৩৩৩৫; সহিহ মুসলিম : হাদিস ৮৮৭৩; মুসনাদে আহমদ : হাদিস ৩৬৩০।

[২৩] পূর্ণনাম : আবুল কাসেম আলি বিন হাসান বিন হিবাতুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন হুসাইন।

২. হাবিল আল্লাহপাকের প্রিয় বান্দা ছিলেন। আর কাবিল তার দুষ্কর্মের ফলে আল্লাহ তাআলার রহমতের দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো। তাই প্রয়োজন ছিলো হাবিলের দেহের অপমান যেনো না হয়। আর আদম আ.-এর বংশধরগণের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মৃত্যুর পর কবরস্থিত করার প্রথা প্রবর্তিত হোক। আর ইনসাফের দাবি ছিলো যে, কাবিলের এই হীনকর্মের জন্য দুনিয়াতেও তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হোক এবং তাকে এই ক্ষমতা দেয়া হোক যাতে সে নিজেই নিজের জ্ঞানহীনতা ও নীচতা অনুভব করতে পারে। তাই তার অন্তরে ইলহামও করা হয় নি এবং তার হীনকর্ম গোপন করার হন্য জ্ঞানের আলোও দান করা হয় নি। বরং একটি তুচ্ছ প্রাণীকে তার পথপ্রদর্শক বানিয়ে দেয়া হয়েছে যা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনায় তুলনাহীন এবং স্বভাবের নীচতার দৃষ্টান্তস্থল। অবশেষে কাবিলকে এ-কথা বলতেই হলো—

يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي

"হায়! আমি কি এই কাকের মতো হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ গোপন করতে পারি?"

দ্রষ্টব্য : জীবনচরিত রচয়িতা এবং ইতিহাসবিদদের সাধারণ নিয়ম এই যে, তাঁরা হযরত আদম আ.-এর পরেই হযরত ইদরিস আ.-এর উল্লেখ করে থাকেন। তারপর হযরত নুহ আ.-এর উল্লেখ করেন। কিন্তু একটু পরেই আমরা ইদরিস আ.-সম্পর্কিত যে-মতভেদ উল্লেখ করতে যাচ্ছি, তার ওপর ভিত্তি করে প্রথমে হযরত নুহ আ. এবং পরে হযরত ইদরিস আ.-এর আলোচনা করবো। তারপরও এতে যাঁদের অরুচি হয় তাঁরা প্রথমে হযরত ইদরিস আ. এবং পরে হযরত নুহ আ.-এর ঘটনা পাঠ করবেন।

হযরত নুহ আলাইহিস সালাম

হযরত নুহ আ. প্রথম রাসুল

হযরত আদম আ.-এর পর ইনি প্রথম নবী যাঁকে প্রথম রাসুলের পদ দান করা হয়েছে। সহিহ মুসলিম শরিফের শাফাআত অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে—

يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا

'হে নুহ, আপনি পৃথিবীতে প্রথম রাসুল এবং আল্লাহ তাআলা আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।'

বংশপরম্পরা

নসবনামা বা বংশতত্ত্ব বিদ্যায় অভিজ্ঞ মনীষীগণ হযরত নুহ আ.-এর বংশপরম্পরা এভাবে বর্ণনা করেছেন : নুহ বিন লামাক বিন মুতাওশালিখ বিন আখনুক বিন ইয়ারুদ বিন মাহলাইল বিন কীনান বিন আনুশ বিন শীশ আ. বিন আদম আ.। ইতিহাসবিদগণ এবং তাওরাত একে শুদ্ধ হিসেবে মেনে নিলেও এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে; বরং একিন ও বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে হযরত আদম আ. এবং হযরত নুহ আ.-এর মধ্যস্থলে উপরিউক্ত বংশসূত্রের চেয়ে আরো বেশি বংশসূত্র রয়েছে। তাওরাতে হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টি ও নুহ আ.-এর জন্ম এবং আদম আ.-এর ওফাত ও নুহ আ.-এর জন্ম-এর মধ্যবর্তী সময়কাল সম্পর্কে যে-আলোচনা রয়েছে তাও আমরা এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি। অবশ্য একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে যে তাওরাতের ইবরানি (হিব্রু), সামি ও ইউনানি ভাষার নুসখাগুলোর মধ্যে অতিমাত্রায় অসামঞ্জস্য রয়েছে। আর এই এলোচ্য বিষয়ের ওপর আল্লামা শায়খ রহমতুল্লাহ হিন্দি (কিরানাহ জিলা, মুজাফফরনগর)-এর বিখ্যাত কিতাব প্রণিধানযোগ্য। তাওরাত থেকে উদ্ধৃত নকশা নিচে বর্ণিত হলো—

প্রথম নকশা

[পুত্রের জন্মকালে পিতার বয়স]

পুত্রের নাম	পিতার নাম	পুত্রের জন্মকালে পিতার বয়স
শীশ আ.	আদম আ.	১৩০ বছর

আনুশ	শীশ আ.	১৫০	বছর
কীনান	আনুশ	৯০	বছর
মাহলাইল	কীনান	৭০	বছর
ইয়ারুদ	মাহলাইল	৬৫	বছর
আখনুখ	ইয়ারুদ	১৬২	বছর
মুতাওশালিখ	আখনুখ	৬৫	বছর
লামাক	মুতাওশালিখ	১৮৭	বছর
নুহ আ.	লামাক	১৮২	বছর[২৭]

দ্বিতীয় নকশা

হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টি ও নুহ আ.-এর জন্ম-এর মধ্যবর্তী সময়কাল	১০৫৬ বছর
আদম আ.-এর আয়ুষ্কাল	৯৩০ বছর
হযরত আদম আ.-এর ওফাত ও নুহ আ.-এর জন্ম-এর মধ্যবর্তী সময়কাল	১০২৬ বছর

---

[২৭] আল্লামা আবুল কাসেম আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আস-সুহাইলি (মৃত্যু : ৫৮১ হিজরি) কর্তৃক রচিত الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام গ্রন্থে বর্ণিত হযরত নুহ আ.-এর বংশপরম্পরা :

نوح بن لمك بن مَتُوشَلَخَ بن أخنوخ، وهو إدريس النبي – فيما يزعمون – والله أعلم وكان أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم – ابن يرد بن مهليل بن قينن بن يانش بن شيث بن آدم صلى الله عليه وسلم

আল্লামা আবুল কাসেম আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আস-সুহাইলি (মৃত্যু : ৫৮১ হিজরি) কর্তৃক রচিত الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

হাফিয ইবনে কাসির রহ. কর্তৃক রচিত আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে বর্ণিত নুহ আ.-এর বংশপরম্পরা এমন :

هو نوح بن لامك بن مَتُوشَلَخ بن خنوخ – وهو إدريس – بن يرد بن مهلاييل بن قينن بن انوش بن شيث بن آدم ابي البشر عليه السلام

অর্থাৎ নামের বানান ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন : লামাক (لمك) বা লা-মাক (لامك); মাতুশালাখা (مَتُوشلخ) বা মুতাওশালিখ (متوشالخ); আখনুখ (اخنوخ) বা খানুক (خنوخ); ইয়ানুশ (يانش) বা আনুশ (انوش); মাহলাইল (مهليل) বা মাহলা-ইল (مهلاييل) ; কীনান (قينن) বা কীনা-ন (قينان)। -অনুবাদক

আপনি যদি এই নকশা দুটির মধ্যে হিসেবের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে চান তাহলে সফলকাম হতে পারবেন না। কারণ উপরের লাইনগুলো থেকে এই সত্য পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এগুলো হলো অনুমান ও ধারণাপ্রসূত বক্তব্য। এ-কারণেই এ-বিষয়ে তাওরাতের বিভিন্ন নুসখায় (কপিতে) অমাঞ্জস্য দেখা যায়।

কুরআন মাজিদে হযরত নুহ আ.-এর আলোচনা

কুরআন মাজিদের এই নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রচলিত আছে যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো থেকে কোনো ঘটনার বর্ণনাকালে তার মুখ্য উদ্দেশ্য উপদেশ ও নসিহতের প্রেক্ষিতে ঘটনার মধ্য থেকে কেবল ওই অংশগুলোই বর্ণনা করে থাকে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যার বর্ণনা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়। আর সংক্ষেপ, বিস্তারিত বর্ণনা এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তির মধ্যে একই উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে। তা ওয়াজ-নসিহত ও উপদেশের উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু নয়। এই বর্ণনাপদ্ধতি অনুসারে কুরআন মাজিদে হযরত নুহ আ.-এর ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতরূপে ৪৩ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। নিম্নবর্ণিত ছক থেকে তা অনুধাবন করা যাবে—

সুরা	সুরার নাম	আয়াত
৩	সুরা আলে ইমরান	৩৩
৪	সুরা আন-নিসা	১৬৩
৬	সুরা আল-আন'আম	৮৪
৭	সুরা আল-আ'রাফ	৫৯, ৬৯
৯	সুরা আত-তাওবা	৭০
১০	সুরা ইউনুস	৭১
১১	সুরা হুদ	২৫, ৩২, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৮৯
১৪	সুরা ইবারহিম	৯
১৭	সুরা আল-ইসরা	৩, ১৭
১৯	সুরা মাইয়াম	৫৮
২১	সুরা আল-আম্বিয়া	৭৬
২২	সুরা আল-হাজ্জ	৪২

২৩	সুরা আল-মুমিনুন	২৩
২৫	সুরা আল-ফুরকান	৩৭
২৬	সুরা আশ-শুআরা	১০৫, ১০৬, ১১৬
২৯	সুরা আল-আনকাবুত	১৪
৩৩	সুরা আল-আহযাব	৭
৩৭	সুরা আস-সাফ্ফাত	৭৫, ৭৯
৩৮	সুরা সোয়াদ	১২
৪০	সুরা গাফের	৫, ৩১
৪২	সুরা আশ-শুরা	১৩
৫০	সুরা কাফ	১২
৫১	সুরা আয-যারিয়াত	৪৬
৫৩	সুরা আন-নাজম	৫২
৫৪	সুরা আল-কামার	৯
৫৭	সুরা আ-হাদিদ	২৬
৬৬	সুরা আত-তাহরিম	১০
৭১	সুরা নুহ	১, ২১, ২৬

কিন্তু এই ঘটনাটির গুরুত্বপূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ শুধু সুরা আ'রাফ, সুরা হুদ, সুরা মুমেনুন, সুরা শুআরা, সুরা কামার এবং সুরা নুহের মধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। তা থেকে হযরত নুহ আ. এবং তাঁর কওম সম্পর্কে যে-ইতিহাস জানা যায় তাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

হযরত নুহ আ.-এর কওম

হযরত নুহ আ. নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার আগে তাঁর গোটা সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার তাওহিদ ও বিশুদ্ধ ধর্মীয় আলো থেকে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ হয়ে পড়েছিলো। তারা প্রকৃত স্রষ্টার পরিবর্তে নিজেদের হাতে নির্মিত মূর্তির পূজা করছিলো।

দাওয়াত ও তাবলিগ এবং কওমের নাফরমানি

অবশেষে আল্লাহ তাআলার চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী এই কওমের হেদায়েত ও সঠিক পথে পরিচালনার জন্য একজন পথপ্রদর্শক এবং

আল্লাহর সত্য রাসুল হিসেবে হযরত নুহ আ.-কে প্রেরণ করা হলো। হযরত নুহ আ. তাঁর কওমকে সত্যপথে আহ্বান করলেন, সত্যধর্মের দাওয়াত দিলেন; কিন্তু তাঁর কওম সেই আহ্বানে সাড়া দিলো না। তারা বরং ঘৃণা ও অবজ্ঞার সঙ্গে তাঁকে অস্বীকার করলো এবং এতে তারা হঠকারিতাও করলো। কওমের নেতৃস্থানীয় ও সরদার লোকে তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা এবং অপদস্থ করার কোনো পন্থাই বাদ দিলো না। আর তাদের অনুসারীরা তাদেরই অনুসরণ ও অনুকরণের প্রমাণ দেবার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা করার সব পন্থাই নুহ আ.-এর ওপর প্রয়োগ করলো। তারা এ-বিষয়টির প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করলো যে, যে-ব্যক্তি স্বচ্ছলতা ও বিত্তবৈভবে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠও নয়, আবার মানবতার মর্যাদার দিক থেকে উচ্চ ফেরেশতার আকৃতিরও নয়, আমাদের নেতা ও পরিচালক হওয়ার কী অধিকার তার আছে? কেনো আমরা তার আদেশনিষেধ মান্য করবো?

তারা কওমের দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে যখন হযরত নুহ আ.-এর অনুসারী ও অনুগত্যশীল দেখতে পেতো তখন অহংকারের সঙ্গে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতো, 'আমরা এদের মতো নই যে তোমার হুকুমবরদার ও অনুগত হয়ে যাবো এবং তোমাকে অনুসরণীয় নেতা বলে মেনে নেবো।' তারা মনে করতো, ওই দুর্বল ও নিম্নজাতের লোকেরা হযরত নুহ আ.-এর অন্ধ অনুসারী। তারা বুদ্ধিমান নয় যে আমাদের মতো যাচাই-বাছাই করে স্থির সিদ্ধান্তের সঙ্গে কাজ করবে এবং আমাদের মতো জ্ঞানীও নয় যে প্রকৃত সত্য ও তত্ত্ব বুঝে নেবে। যদি উচ্চ শ্রেণির লোকেরা কখনো হযরত নুহ আ.-এর বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দিতো, তাঁর কাছে গিয়ে গোঁ ধরতো যে এইসব হীন ও গরিব লোকদেরকে তোমার কাছ থেকে বের করে দাও। তাহলে আমরা তোমার কথা শুনবো। কারণ, এদেরকে দেখলে আমাদের ঘৃণার উদ্রেক হয়। ওরা এবং আমরা একসঙ্গে বসতে পারি না।

হযরত নুহ আ. তাদের কথার একটি জবাবই দিতেন যে তা কখনো হতে পারে না। কারণ এঁরা আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দা। তোমরা যা চাচ্ছো আমি যদি তাঁদের সঙ্গে সেই ধরনের আচরণ করি তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে কোথাও আমার আশ্রয়স্থল থাকবে না। আমি আল্লাহ তাআলার মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করি। তাঁর দরবারে কেবল একনিষ্ঠ ও খাঁটি ইবাদত-বন্দেগির মর্যাদা আছে। ওখানে ধনী ও দরিদ্রের কোনো প্রশ্ন

নেই। নুহ আ. আরো বলতেন, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমি অদৃশ্যের খবরাখবর জানি বলে দাবি করি না এবং আমি ফেরেশতা হওয়ারও দাবি করি না। আমি আল্লাহর মনোনীত নবী এবং রাসুল। ধর্মের দাওয়াত প্রদান করা এবং সৎপথ প্রদর্শন করা আমার মূল উদ্দেশ্য ও কর্তব্য। বিত্তবৈভবে উন্নতি করা, অদৃশ্যের খবরাখবর অবগত হওয়া এবং ফেরেশতাসুলভ আকৃতি হওয়ার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? কওমের দরিদ্র ও দুর্বল মানুষেরা যে আল্লাহর প্রতি খাঁটি অন্তরে ঈমান এনেছে তা তোমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও হীন মনে হচ্ছে এ-কারণে যে তারা তোমাদের মতো ধন-সম্পদের অধিকারী নয়। এ-কারণেই তারা তোমাদের ধারণায় কোনো কল্যাণ পেতে পারে না এবং সৌভাগ্যও লাভ করতে পারে না। কেননা, তোমরা ধারণা করে থাক, কল্যাণ ও সৌভাগ্য ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; মর্যাদাহীনতা ও দরিদ্রতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

সুতরাং বিষয় এই যে, সৌভাগ্য ও কল্যাণ সম্পর্কে আল্লাহর আইন-কানুন বাহ্যিক ধনদৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অনুগামী নয়। তাঁর দরবারে সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভ করা বিত্তবৈভবের চাকচিক্যের প্রভাবাধীন নয়; বরং তার বিপরীতে নফসের প্রশান্তি, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, অন্তরের অমুখাপেক্ষিতা, নিয়তের শুদ্ধতা ও একনিষ্ঠতা এবং আমলের ওপর নির্ভরশীল।

হযরত নুহ আ. এটাও বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন যে আমি আমার এই দাওয়াত প্রদান ও পথপ্রদর্শনের বিনিময়ে তোমাদের কাছে ধন-সম্পদও চাই না এবং মান-মর্যাদাও আকাঙ্ক্ষা করি না। পারিশ্রমিকের দাবিও আমি করি না। আমার এই খেদমতের প্রকৃত প্রতিদান ও সওয়াব একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে রয়েছে। তিনিই সর্বোত্তম বিনিময় প্রদানকারী।

মোটকথা, সুরা হুদ হক ও তাবলিগের এ-সকল বাদানুবাদ, বিতর্ক এবং হকের পয়গাম সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের এরশাদ সমূহের একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার।

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ () قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ

عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ () وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ () وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ () وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (سورة هود)

'তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যারা ছিলো কাফের (কুফরির পথ অবলম্বন করছিলো) তারা বললো, "আমরা তোমাকে তো আমাদের মতো মানুষ ব্যতীত কিছু দেখছি না; আমরা তো দেখছি তোমার বাহ্যিক (না শুনে না বুঝে) অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যেই বাহ্য দৃষ্টিতেই অধম এবং আমরা আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।" তিনি বললেন, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমাকে বলো, (তোমরা ভেবে দেখেছো কি) আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ থেকে দান করে থাকেন, (আমাকে সত্যপথ প্রদর্শন করে থাকেন) আর তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে, তবে (যা করছি তার চেয়ে বেশি আর কী করতে পারি) আমি কি তোমাদেরকে এই বিষয়ে বাধ্য করতে পারি, যখন তোমরা তা অপছন্দ করো? হে আমার সম্প্রদায়, এর পরিবর্তে আমি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ যাচঞা করি না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই কাছে এবং (এটা বুঝে নাও যে) মুমিনদেরকে (তারা তোমাদের দৃষ্টিতে যতই নীচ হোক না কেনো) তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়; (এটা আমি কখনো করতে পারি না।) তারা (একদিন) নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে (এবং আল্লাহ আমাদের সবারই হিসেব নেবেন)। কিন্তু (আমি তোমাদেরকে কেমন করে বুঝাবো,) আমি তো দেখছি তোমরা (সত্য সম্পর্কে) এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। হে আমার সম্প্রদায়, আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দিই, (এবং এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কৈফিয়ত চাওয়া হয় আর তার দরবারে প্রিয় হওয়ার মাপকাঠি হলো ঈমান ও আমল; তোমাদের বানোয়াট মর্যাদা বা নীচতা নয়,) তাহলে আল্লাহ থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? (আল্লাহর মোকাবিলায় কে

আছে যে আমাকে সাহায্য করবে?) তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? আমি তোমাদেরকে বলি না, "আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে।" আর আমি অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত নই এবং আমি এটাও বলি না যে আমি ফেরেশতা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা নীচ তাদের সম্পর্কে আমি বলি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনোই কল্যাণ দান করবেন না (যেমন তোমাদের বিশ্বাস); তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত। তাহলে আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' [সূরা হূদ : আয়াত ২৭-৩১]

যাইহোক, হযরত নুহ আ. চরম পর্যায়ের চেষ্টা করলেন যাতে তার হতভাগা কওম বুঝতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার রহমত লাভের উপযোগী হয়ে যায়। কিন্তু কওম তাঁর উপদেশে এবং আদেশনিষেধ মানলো না। নুহ আ.-এর পক্ষ থেকে যে পরিমাণ হেদায়েত ও সত্যের তাবলিগ হলো, তাঁর কওমের পক্ষ থেকে সে পরিমাণ শত্রুতা ও বিরোধিতার বাড়াবাড়ি হলো। হযরত নুহ আ.-কে দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার যাবতীয় উপায় অবলম্বন করা হলো। আর তাদের সরদার ও প্রধানেরা সাধারণ মানুষকে পরিষ্কার বলে দিলো—তোমরা কিছুতেই ওয়াদ্, সুওয়াআ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসর মূর্তিগুলোর পূজা ত্যাগ করবে না।

এটাই সেই আলোচ্য বিষয় যা সুরা নুহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তা নিঃসন্দেহে হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতার প্রধান বিষয়গুলো প্রকাশ করছে—

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ () قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ () أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ () يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ () قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا () فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا () وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا () ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا () ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا () فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (سورة نوح)

নুহকে আমি তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এই নির্দেশসহ : তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক করো তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার পূর্বে। তিনি বলেছিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়, আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী এ-বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো ও তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো (আমার কথা মান্য করো); তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না; যদি তোমরা তা জানতে!" তিনি বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত আহ্বান করেছি; কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়নপ্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। (আমার ডাকায় তারা আরো বেশি পলায়ন করেছে।) আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি যাতে তুমি তাদের ক্ষমা করো, তারা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করা, নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে (কাপড় মুড়ি দিয়ে থাকে) ও গোঁ ধরতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। এরপর আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে, পরে আমি উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করেছি (আহ্বান করেছি) এবং উপদেশ দিয়েছি গোপনে। বলেছি, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, (তাঁর কাছ তোমাদের গুনাহ মাফ করিয়ে নাও) তিনি তো মহাক্ষমাশীল।" [সুরা নুহ : আয়াত ১-১০]

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

(سورة نوح)

'এবং বলেছিলো, "তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেবদেবীকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্, সুওয়াআ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে।" (এগুলো নুহ আ.-এর কওমের দেব-দেবীর নাম।) [সুরা নুহ : আয়াত ২৩]

অবশেষে তারা বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলো, হে নুহ, আর আমাদের সঙ্গে কলহ-বিবাদ করো না আর আমাদের এই অবাধ্যাচরণের কারণে তোমার আল্লাহকে বলে যে-শাস্তি আনতে পারো নিয়ে আসো।

তাদের এই উক্তিটি আল্লাহ নিম্নলিখিত আয়াতে বর্ণনা করেছেন—

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

(سورة نوح)

'তারা বললো, "হে নুহ, তুমি তো আমাদের সঙ্গে বিতণ্ডা করেছো—আমাদের সঙ্গে তুমি বিতণ্ডা করেছো অতি মাত্রায়; (ঝগড়া-বিতণ্ডার পালা এখন শেষ করো।) সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও আমাদেরকে যার (আল্লাহর যে-শাস্তির) ভয় দেখাচ্ছো তা আনয়ন করো।' [সুরা হুদ : আয়াত ৩২]

হযরত নুহ আ. এই কথা শুনে তাদের জবাব দিলেন, আল্লাহপাকের শাস্তি আমার অধিকারে নয়। তা তাঁরই কর্তৃত্বাধীন রয়েছে যিনি আমাকে রাসুলরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলেই সবকিছু হয়ে যাবে।

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

'তিনি বললেন, "ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা তোমাদের কাছে উপস্থিত করবেন এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।" [সুরা হুদ : আয়াত ৩৩]

মোটকথা, হযরত নুহ আ. যখন তাঁর কওমের হেদায়েতপ্রাপ্তি থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়লেন, তাদের অপচেষ্টা, হঠকারিতা এবং ঔদ্ধত্য ও অহংকার তার কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়লো এবং কুরআন মাজিদের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর সাড়ে নয়শো বছরের অবিরাম ও অক্লান্ত হেদায়েত, দাওয়াত ও তাবলিগের প্রতিক্রিয়া তাদের ওপর দেখলেন না, তিনি অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় ও অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন—

وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (سورة هود)

'এবং নুহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিলো, "যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্যকেউ কখনো ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা করে তার জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না।" [সুরা হুদ : আয়াত ৩৬]

হযরত নুহ আ. যখন জানতে পারলেন যে তাঁর সত্যপ্রচারে এবং দাওয়াত ও তাবলিগে কোনো ত্রুটি হয় নি; বরং তা অমান্যকারীদের যোগ্যতার ত্রুটি ও তাদের নিজেদের অবাধ্যতার ফল, তখন তিনি তাদের হীন কর্মকাণ্ড ও গর্হিত গতিবিধির কারণে ব্যথিত হয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে এই দোয়া করলেন—

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا () إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (سورة نوح)

'হে আমার প্রতিপালক, পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্যে থেকে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। (কাউকে জমিনের ওপর অবশিষ্ট রেখো না।) তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফের।' [সুরা নুহ : আয়াত ২৬-২৭]

নৌকা নির্মাণ

আল্লাহ তাআলা হযরত নুহ আ.-এর দোয়া কবুল করলেন এবং আমলের প্রতিফলের নিয়ম অনুসারে উদ্ধত ও অবাধ্য লোকদের অবধ্যতার শাস্তির ঘোষণা করে দিলেন। আর মুমিনদেরকে রক্ষার জন্য প্রথমে হযরত নুহ আ.-কে নির্দেশ দিলেন যে একটি নৌকা নির্মাণ করো। যাতে বাহ্যিক উপকরণের বিবেচনায় তিনি এবং অনুগত মুমিনগণ সেই শাস্তি থেকে সুরক্ষিত থাকেন। অবাধ্য ও নাফরমান লোকদের প্রতি অচিরকালের মধ্যেই সেই শাস্তি নাযিল হবে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত নুহ আ. নৌকা নির্মাণ করতে শুরু করলে তারা হাসি-তামাশা ও বিদ্রূপ করতে লাগলো। যখনই তারা নির্মাণাধীন নৌকার কাছ দিয়ে যাতায়াত করতো তখনই বলতো, বাহ চমৎকার! যখন আমরা পানিতে ডুবতে শুরু করবো তখন তুমি ও তোমার অনুসারীরা এই নৌকায় আরোহণ করে সুরক্ষিত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। কী নির্বোধসুলভ কল্পনা। হযরত নুহ আ. তাদের পরিণাম সম্পর্কে অসতর্কতা এবং আল্লাহর অবাধ্যাচরণের প্রতি তাদের দুঃসাহস দেখে তাদেরই অনুরূপ জবাব দিতেন এবং নিজের কাজে মনোযোগ দিতেন। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছিলেন—

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো এবং যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না; (তাদের জন্য সুপারিশ করো না) তারা তো নিমজ্জিত হবে।' [সুরা হুদ : আয়াত ৩৭]

অবশেষে নুহ আ.-এর নৌকা প্রস্তুত হয়ে গেলো। তখন আল্লাহর প্রতিশ্রুত শাস্তি নাযিল হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। নুহ আ. শাস্তির প্রথম আলামত দেখতে পেলেন। এটা তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিলো। অর্থাৎ

ভূগর্ভ থেকে পানি উথলে উঠতে শুরু করলো। তখন আল্লাহর ওহি তাঁকে এই আদেশ শোনালো—তোমার বংশধরদেরকে নৌকায় আরোহণের নির্দেশ দাও। আর সমস্ত প্রাণী থেকে এক-এক জোড়া করে উঠিয়ে নাও। (প্রায় ৪০ জনের) সেই দলটিকেও নৌকায় আরোহণ করতে আদেশ দাও যারা তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

আল্লাহর তাআলার ওহি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়ার পর আকাশের প্রতি আদেশ হলো পানি বর্ষণ করতে শুরু করো; আর জমিনের ফোয়ারাসমূহের প্রতি হলো, পূর্ণ মাত্রায় উথলাতে থাকো।

আল্লাহর আদেশে এসবকিছু হতে থাকলো এবং নৌকা তাঁর হেফাজতে পানির ওপর ভাসতে লাগলো। এ-সময় সব অবিশ্বাসী ও অবাধ্য লোক পানিতে ডুবে গেলো এবং আল্লাহ তাআলার বিধান 'কর্মের প্রতিফল' অনুযায়ী নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করলো।

হযরত নুহ আ.-এর পুত্র[২৮]

এখন একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা হলো হযরত নুহ আ. প্লাবনের শাস্তির সময় আল্লাহর কাছে তাঁর পুত্রের নাজাতের ব্যাপারে সুপারিশ করলেন এবং আল্লাহ তাঁকে সুপারিশ করতে বারণ করলেন। কুরআন মাজিদের নিম্নবর্ণিত আয়াত থেকে উক্ত বিষয়টির গুরুত্ব অনুমিত হয়—

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ () قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا

---

[২৮] হযরত নুহ আ.-এর চার পুত্র ছিলো : ইয়াফিস, সাম, হাম কিনআন (يافث – سام – حام – كنعان)। এই চতুর্থজন অর্থাৎ কিনআন প্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। আর বাকি তিনজন সম্পর্কে হাফিয ইবনে কাসির বলেছেন, এই পৃথিবীতে বর্তমানে যত আদম সন্তান আছে তারা সবাই নুহ আ.-এর এই তিন পুত্রের বংশধর। সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নুহের পুত্র তিনজন : আরবদের পিতা সাম; সুদানিদের পিতা হাম এবং তুর্কিদের পিতা ইয়াফেস।' [মুসনাদে আহমদ : হাদিস ২০১২৬] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুহ আ.-এর কাফের পুত্রের নাম উল্লেখ করেন নি। কেউ কেউ বলেছেন কিনআনের আরেক নাম ইয়াম (يام)। -অনুবাদক

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ () قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ () قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة هود)

'নুহ তাঁর প্রতিপালককে সম্বোধন করে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত (সে আমার পরিবারেরই একজন) এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য; আর আপনি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।" তিনি বললেন, "হে নুহ, সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরায় যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে-বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করো না। (যে-বিষয়ে কিছু জানো না সে-ব্যাপারে আমার কাছে আবেদন করা উচিত নয়।) আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেনো অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।" তিনি বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, যে-বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে-বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, তার জন্য আমি আপনার শরণ নিচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করে এবং দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" বলা হলো, "হে নুহ, (নৌকা থেকে মাটিতে) অবতরণ করো আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও কল্যাণসহ, তোমার প্রতি ও যেসব সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি; অপর সম্প্রদায়সমূকে[২৯] আমি জীবন উপভোগ করতে দেবো, পরে আমা থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করবে।" [সুরা হুদ : আয়াত ৪৫-৪৮]

এসব আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা নুহ আ.-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি নুহকে ও তাঁর বংশের লোকদেরকে প্লাবনের ধ্বংস থেকে মুক্তি দেবেন। এ-কারণেই নুহ আ. তাঁর পুত্র কিনআনের জন্য দোয়া করেছিলেন। এর ফলে রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তাঁকে ধমক প্রদান করা হলো যে, 'যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে-বিষয়ে এমনভাবে আবেদন করার অধিকার তোমার নেই।' এতে হযরত নুহ আ. নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং

[২৯] নুহ আ.-এর পরবর্তীকালের কাফের সম্প্রদায়।

তাঁর অনুগ্রহ কামনা করলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকেও তিনি আশানুরূপ জবাব পেলেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে হযরত নুহ আ.-এর প্রার্থনাটি কোন প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে করা হয়েছিলো? সেই প্রতিশ্রুতিটি পূর্ণ করা হয়েছিলো কি-না এবং হযরত নুহ আ. সেই প্রতিশ্রুতিটি বুঝতে কী ধরনের ভুল করেছিলেন? আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সতর্কীকরণের পর কীভাবে তিনি প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন? এসব জিজ্ঞাসার জবাবে নিম্নবর্ণিত আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য।

حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (سورة هود)

'অবশেষে যখন আমার আদেশ (আযাব) এলো এবং উনুন (চুলার তলদেশ থেকে পানি) উথলে উঠলো[৩০]; আমি বললাম, "তাতে উঠিয়ে নাও প্রত্যেক জোড়ার দুটি, যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে।" তার সঙ্গে ঈমান এনেছিলো কয়েকজন।' [সূরা হুদ : আয়াত ৪০]

এ-আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা হযরত নুহ আ.-কে বলেছিলেন, তোমার বংশের মধ্যে যাদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য তৈরি করা হয়েছে তাদেরকে এই নৌকায় উঠিয়ে নাও; কিন্তু তোমার গোটা পরিবার নাজাত পাওয়ার উপযুক্ত নয়; বরং তাদের মধ্যে কেউ এমনও আছে যার ওপর আল্লাহর শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ অর্থাৎ ওই ব্যক্তি যার দণ্ড সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ আগে থেকে চূড়ান্ত হয়ে আছে।

হযরত নুহ আ. তাঁর স্ত্রীর আনুপূর্বিক কুফরি আকিদা ও আচরণের ফলে এ-বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন যে সে আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের ঈমান আনবে এবং তাওহিদের ডাকে সাড়া দেবে। কাজে নাজাত থেকে বাদ পড়ার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্ত্রীকেই মনে করলেন। পক্ষান্তরে পুত্রের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্যের কারণে মনে করলেন যে এখন সে তার মায়ের

---

[৩০] উনুন থেকে পানি উথলে উঠলো। এর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ প্লাবিত হলো।

অনুগামী হলেও নৌকায় উঠে মুমিনদের সংসর্গে প্রভাবিত হয়ে হয়তো ঈমান আনতেও পারে এবং কাফেরদের সঙ্গে ওঠাবসা করার প্রভাব দূর হতে পারে। এটা ভেবেই তিনি আল্লাহর বাণী وَأَهْلَكَ (এবং তোমার পরিবারকেও উঠিয়ে নাও)-এর ব্যাপকতাসূচক অর্থ গ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহর দরবারে কিনআনের নাজাতের জন্য দোয়া করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর উচ্চ মর্যাদাবান নবীর এই অনুমান পছন্দ করলেন না। তাঁকে সতর্ক করে দিলেন যে, যে-ব্যক্তি সবসময় ওহির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে থাকে তার পক্ষে পুত্রের বাৎসল্যের আতিশয্যে এতবেশি অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়া উচিত নয় যে ওহির অপেক্ষা না করে নিজেই কেয়াস ও অনুমানের ভিত্তিতে পরিণাম পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। অথচ সে জানে যে মুক্তি ও নাজাতের প্রতিশ্রুতি কেবল মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট। আর কিনআন কাফেরদের সঙ্গে কাফেরই থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার এই কিয়াস ও অনুমানের ভিত্তি এ-ধরনের আবেদন নবী ও রাসুলের পদের জন্য শোভনীয় নয় এবং তাদের মর্যাদার উপযোগীও নয়।

যেনো হযরত নুহ আ.-কে আল্লাহ তাআলার এভাবে সম্বোধন করা মূলত ধমক ও তিরস্কার ছিলো না; বরং বাস্তবতা পর্যবেক্ষণের প্রতি আহ্বান ছিলো। যা শোনামাত্রই তিনি নিজের মনুষ্যত্ব ও অনুগত বান্দা হওয়ার স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা ও বরকত লাভ করে আনন্দিত ও সফলকাম হলেন। সুতরাং এতে পাপের প্রশ্ন ছিলো না এবং তা নবী ও রাসুলের নিষ্পাপ হওয়ার বিরোধীও ছিলো না। এ-কারণে আল্লাহপাক এটাকে 'অজ্ঞতা' শব্দে প্রকাশ করেছেন। পাপ বা অবাধ্যতা শব্দ ব্যবহার করেন নি।

যাইহোক, হযরত নুহ আ.-এর সামনে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে পড়লো যে আল্লাহ তাআলার নাজাতের প্রতিশ্রুতি বংশ বা পরিবারের ভিত্তিতে ছিলো না; বরং আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে ছিলো। এ-কারণেই তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করার রোখ পরিবর্তন করে কিনআনকে সম্বোধন করলেন এবং নবুওতের কর্তব্য সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কামনা করলেন— কিনাআনও যেনো মুমিন হয়ে আল্লাহর নাজাতের অংশীদার হয়। কিন্তু সেই দুর্ভাগা কিনআন জবাব দিলো—

قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ

'সে (নুহ আ.-এর পুত্র) বললো, "আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেবো যা আমাকে প্লাবন[৩১] থেকে রক্ষা করবে।" [সুরা হুদ : আয়াত ৪৩]

কিনআনের কথা শুনে নুহ আ. বললেন—

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (سورة هود)

'তিনি বললেন, "আজ আল্লাহর নির্দেশ থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে আল্লাহ যাকে দয়া করবেন সে ব্যতীত।" এরপর তরঙ্গ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো (তরঙ্গ তাদের মধ্যখানে বাঁধ হয়ে দাঁড়ালো) এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো।' [সুরা হুদ : আয়াত ৪৩]

জুদি পাহাড়

মোটকথা, আল্লাহর আদেশে আযাব সমাপ্ত হলে হযরত নুহ আ.-এর নৌকা জুদি পাহাড়ে গিয়ে ঠেকলো।

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (سورة هود)

'এরপর বলা হলো, (আল্লাহ তাআলা বললেন,) "হে পৃথিবী, তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ ক্ষান্ত হও।" এরপর বন্যা প্রশমিত হলো এবং কর্ম সমাপ্ত হলো, নৌকা জুদি পর্বতের ওপর (আরারাত পর্বতমালার একটি চূড়া) স্থির হলো এবং ঘোষণা করা হলো, জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক।' [সুরা হুদ : আয়াত ৪৪]

তাওরাত কিতাবে বলা হয়েছে যে জুদি আরারাত পর্বতমালার মধ্যে একটি পর্বত। আরারাত আসলে দ্বীপের নাম। অর্থাৎ দজলা ও ফোরাত নদী দুটির মধ্যবর্তী 'দিয়ারে বিকর' থেকে বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত যে-অঞ্চল তার নামই আরারাত।

প্লাবনের পানি ক্রমশ শুকাতে শুরু করলো এবং নৌকার আরোহীরা ক্রমশ শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে আল্লাহর জমিনের ওপর পা রাখলো। এর ভিত্তিতেই হযরত নুহ আলাইহিস সালামকে দ্বিতীয় আদম অর্থাৎ

---

[৩১] الْمَاءِ দ্বারা এখানে প্লাবন বুঝানো হচ্ছে।

মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা বলা হয়। খুব সম্ভব এ-কারণেই তাঁকে হাদিস শরিফে প্রথম রাসুল বলা হয়েছে।

যদিও এ-পর্যন্ত এসেই হযরত নুহ আ.-এর ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা শেষ হয়ে যায়, তারপরও এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় যেসব ইলমি ও ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয় বা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে তাও আলোচনার যোগ্য। নিচের অংশে ধারাবাহিকভাবে এগুলোর আলোচনা করা হলো।

হযরত নুহ আ.-এর প্লাবন ব্যাপক ছিলো না-কি নির্দিষ্ট এলাকায় ছিলো?

হযরত নুহ আ.-এর প্লাবন কি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এসেছিলো, না পৃথিবীর বিশেষ অংশের ওপর সংঘটিত হয়েছিলো?

এ-সম্পর্কে প্রাচীনকালে এবং আধুনিক যুগের আলেম-উলামার মধ্যে আবহমানকাল থেকে দুই ধরনের মত চালু রয়েছে।

উলামায়ে ইসলামের একটি দল, ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আলেমগণ, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যায় বিশেষজ্ঞ এবং পদার্থবিদ্যার ঐতিহাসিকগণের অভিমত এই যে, নুহ আ.-এর প্লাবন সমগ্র পৃথিবীর ওপর আসে নি; বরং পৃথিবীর সেই অংশের ওপর সীমাবদ্ধ ছিলো, যেখানে হযরত নুহ আ.-এর কওম বসবাস করতো। আর সেই অঞ্চলটি আয়তনে একলাখ চব্বিশ হাজার বর্গকিলোমিটার।

তাঁদের মতে, নুহ আ.-এর প্লাবন নির্দিষ্ট অঞ্চলে হওয়ার কারণ এই যে, যদি এই প্লাবন ব্যাপক হতো, তবে তার চিহ্নসমূহ ভূগোলকের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন পর্বতচূড়ায় পরিলক্ষিত হওয়া উচিত ছিলো। অথচ এমন দেখা যায় নি। তা ছাড়া সে-যুগে মানুষের বসতি খুবই সীমাবদ্ধ ছিলো এবং তা সে-অঞ্চলেই ছিলো যেখানে হযরত নুহ আ. ও তাঁর সম্প্রদায় বসবাস করতো। তখনো হযরত আদম আ.-এর বংশধরদের সংখ্যা সেই অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের চেয়ে বেশি ছিলো না। মোটকথা, ওখানকার অধিবাসীরাই ছিলো হযরত আদম আ.-এর মোট সন্তান। ওই অঞ্চলের বাইরে কোথাও কোনো মানুষের বসতি ছিলো না। তাই ওই অঞ্চলটিই শাস্তির উপযোগী ছিলো এবং তাদের ওপরই ওই শাস্তি প্রেরিত হয়েছিলো। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সঙ্গে এই প্লাবনের বা শাস্তির কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

আর কোনো কোনো উলামায়ে ইসলাম, ভূতত্ত্ববিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ও পদার্থবিজ্ঞানীর মতে নুহ আ.-এর প্লাবন সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের ওপর ব্যাপক ছিলো। আর ব্যাপক প্লাবন এই একটিই ছিলো না; বরং তাঁদের মতে এই ভূ-পৃষ্ঠের ওপর এই শ্রেণির অনেক প্লাবন এসেছিলো, তার মধ্যে এটিও একটি। আর তাঁরা উপরিউক্ত প্রথম মতাবলম্বীদের 'চিহ্নসমূহ' বা 'আলামতসমূহ'-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার এই জবাব দিচ্ছেন যে, 'জাযিরা' বা 'ইরাকে আরব'-এর অংশটুকু ছাড়াও উচ্চ পর্বতসমূহের শিখরে এমনসব প্রাণীর অনেক দেহপিঞ্জর ও হাড় পাওয়া গেছে যাদের সম্পর্কে ভূতত্ত্ববিদগণের অভিমত হলো, এগুলো জলজ প্রাণী; এরা শুধু পানিতেই জীবিত থাকতে পারে। পানির বাইরে এক মুহূর্তের জন্যও তাদের জীবিত থাকা কঠিন। ভূগোলকের বিভিন্ন পর্বতের উঁচু চূড়াসমূহের ওপর ওইসব বস্তুর অস্তিত্ব এ-কথা প্রমাণ করে যে কোনোকালে পানির এক বিশাল প্লাবন এসেছিলো, যা ওইসব পর্বতের শিখরকে নিমজ্জিত না করে ছাড়ে নি।

দু-ধরনের অভিমতের উপরিউক্ত বিবরণের পর তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে প্রদত্ত হলো।

বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বিশুদ্ধ মত এটাই যে নুহ আ.-এর প্লাবন নির্দিষ্ট অঞ্চলে হয়েছিলো, ব্যাপক ছিলো না। এই অভিমতটিও অনুধাবনযোগ্য যে সমগ্র মানবজাতি নুহ আ.-এর বংশধর থেকে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ আয়াতটি এদিকে কিছুটা ইঙ্গিত করছে।

অবশ্য আল্লাহর নীতিমালা অনুযায়ী কুরআন মাজিদ ওইসব (ঘটনার) বিবরণের প্রতিই লক্ষ রেখেছে যা উপদেশ ও নসিহতের জন্য প্রয়োজনীয় ছিলো। অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয়বস্তুর আলোচনা মোটেই করে নি। সেগুলোকে মানুষের জ্ঞানের উন্নতির প্রতি ন্যস্ত করেছে। কুরআন তো কেবল এতটুকুই বলতে চায় যে ইতিহাসের এই ঘটনা জ্ঞানী ও বিবেকসম্পন্ন লোকদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে একটি সম্প্রদায় আল্লাহর অবাধ্যাচরণে বাড়াবাড়ি করে তাঁর প্রতি প্রেরিত রাসুল হযরত নুহ আ.-এর হেদায়েত ও নসিহতের পয়গামকে অবিশ্বাস করেছে, ওষ্ঠাঘাত করেছে এবং তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম ক্ষমতার নমুনা প্রকাশ করেছেন এবং সেই

পাপাচারী ও অবাধ্য লোকদেরকে তুফান ও প্লাবনে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেই তিনি হযরত নুহ আ. ও তাঁর কতিপয় ঈমানদারের দলকে সুরক্ষিত রেখে নাজাত দিয়েছেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

'তাতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।' [সুরা যুমার : আয়াত ২১]

হযরত নুহ আ.-এর পুত্রের বংশ-সম্পর্কিত আলোচনা

কোনো কোনো আলেম হযরত নুহ আ.-এর পুত্র সম্পর্কে বলেছেন, কিনআন তাঁর আপন পুত্র ছিলো না। এরপর তাঁরা আবার এ-সম্পর্কে দু-ধরনের অভিমত পোষণ করেছেন। একদল বলেন, কিনআন নুহ আ.-এর স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত সন্তান। নুহ আ.-এর সঙ্গে তার মায়ের পুনর্বিবাহের পর নুহ আ.-এর পরিবারে এসেছে নুহ আ.-এরই প্রতিপালনে বেড়ে উঠেছে। অপর একদল আলেম হযরত নুহ আ.-এর সেই কাফের স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করেন।

এসব আলেম-উলামার এই নির্ভর-অযোগ্য এবং সত্য থেকে দূরবর্তী অপব্যাখ্যা করার কারণ হলো তাঁদের ধারণায় নবীর পুত্র কাফের হওয়া খুবই অবোধগম্য বিষয় এবং তা বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তাঁরা কী করে ভুলে যান যে হযরত ইবরাহিম আ.-এর পিতা 'আযার' মূর্তিনির্মাতা ও মূর্তিপূজক কাফের ছিলেন। সুতরাং, যদি একজন উঁচু মর্যাদার অধিকারী নবীর পিতার কুফরির কারণে আল্লাহর রাসুলের উঁচু মর্যাদা ও মহত্ত্বে এবং নবুওত ও রিসালাতের পদের বিন্দুমাত্র হানি না হয়, তাহলে অন্য একজন উঁচু মর্যাদাবান নবীর পুত্রের কুফরির কারণে সেই নবীর মহত্ত্ব ও উঁচু মর্যাদার হানি কী করে ঘটতে পারে? বরং একজন সত্যানুসন্ধানীর দৃষ্টিতে ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কাছে তো এটা বিশ্বনিখিলের স্রষ্টা রাব্বুল আলামিনের কুদরতের বিকাশস্থল যে তিনি কঠিন ভূমিতে গোলাপ উৎপন্ন করেন এবং গোলাপের সুগন্ধ পুষ্পের সঙ্গে কাঁটা সৃষ্টি করে দেন।

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

'অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান।' [সুরা মুমিনুন : আয়াত ১৪]

সুতরাং, কুরআন মাজিদ যেহেতু এ-কথা স্পষ্ট করেছে যে কিনআন হযরত নুহ আ.-এর পুত্র ছিলো, তাহলে বিনাকারণে এ-ধরনের তরল ও সনদবিহীন অপব্যাখ্যার কী প্রয়োজন?

একটি চারিত্রিক বিষয়

এখানে আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার যদিও কুরআন মাজিদের বর্ণনাকেই মেনে নিয়েছেন, তারপরও তার মতে নুহ আ.-এর স্ত্রী যদি কুরআনের বর্ণনামতে কাফের হতে পারে, তবে তার প্রতি অসতীত্বের দোষারোপ করা না জায়েয নয়।

[মূল গ্রন্থকার বলেন,] কিন্তু আমি এ-জাতীয় সব ক্ষেত্রে সবসময় ওইসব বুযুর্গানের বিরুদ্ধ মতই পোষণ করি এবং অস্থিরতা ও বিস্ময়বিহ্বলতার ঘূর্ণিপাকে পতিত হই এ-কথা ভেবে যে এসব আলেম নবী ও রাসুল সম্পর্কে নির্বিচারে মতামত ব্যক্ত করার আগে কেনো তাঁদের কমনীয়তা ও পবিত্রতার প্রতি লক্ষ রাখেন নি যা তাদের আখলাক, সামাজিক আচরণ, শিষ্টাচার ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

দৃষ্টান্ত হিসেবে আলোচ্য হযরত নুহ আ.-এর এই ব্যাপারটিকেই ধরুন : 'কাসাসুল আম্বিয়া'র প্রণেতা এবং কতিপয় অন্যান্য আলেম বলেন, হযরত নুহের স্ত্রী যখন কাফের হতে পারেন তখন অসতী কেনো হতে পারবেন না? কারণ দ্বিতীয় কাজটি অর্থাৎ অসতীত্ব প্রথম কাজটির অর্থাৎ কুফরির চেয়ে অপরাধের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের। এ-বক্তব্যের জবাব এই যে, যদি কুফরি ব্যভিচার অপেক্ষা অনেক জঘন্য ধরনের খারাপ কাজ, তবুও এ-কথা মেনে নেয়ার পরও সেই আলেমদের সঙ্গে আমার কঠোর মতবিরোধ আছে যে কোনো নবীর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থেকে অসতী হবেন আর নবী ও রাসুল তাঁর কাজ সম্পর্কে অনবহিত থাকবেন তা আমি কোনোভাবেই সম্ভব মনে করি না। যদি সৎ, নেককার ও পরহেযগার লোকের স্ত্রী তার স্বামীর অগোচরে এই জাতীয় খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তা সম্ভব। কারণ তিনি তাঁর স্ত্রীর পাপকাজ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারেন। আর যে-পর্যন্ত স্ত্রীর এ-ধরনের বদকাজ স্বামীর গোচরীভূত না হয়, সে-পর্যন্ত স্ত্রীর বদকাজের কারণে স্বামীর পরহেযগারি ও পবিত্রতায় কোনো দোষ আসে না। কিন্তু একজন নবী ও রাসূলের বিষয়টি তা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাঁর

কাছে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআলার ওহি এসে থাকে এবং তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনের মর্যাদাও লাভ করে থাকেন। তা সত্ত্বেও এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে যে নবীর ঘরে একজন কুলটা ও অসতী নারী তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়ে থাকবে, আর আল্লাহ তাআলার ওহি সে-সম্পর্কে একেবারেই নীরব থাকে?

আল্লাহ তাআলার মনোনীত নবী ও রাসুল যখন মানুষের চরিত্র সংশোধন ও ধর্মের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে তাঁকে পবিত্র ও নিষ্পাপ রাখা হয়, যাতে কেউই তাঁর বংশমর্যাদা, আখলাক ও শিষ্টাচার এবং সামজিক আচরণের খুঁত বের করতে না পারে। তাহলে এটা কী করে সম্ভব হতে পারে যে আল্লাহর ওহি এবং আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনের দাবিদার একজন নবীর ঘরে অবাধে চারিত্রিক অপরাধ সংঘটিত হতে থাকে এবং নবীকে অনবহিত ও উদাসীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়।

আমাদের সামনে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর ঘটনাটি এ-পথের দিশারীরূপে বিদ্যমান। অঘটনঘটনপটিয়সী এবং প্রমাণবিহীন কথা বর্ণনাকারীগণ কত কিছুই না করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্ণ মুবারকও তা শুনেছে। দুর্ভাগ্যবান হওয়ার জন্য এবং সৌভাগ্যবান হওয়ার জন্য পরিষ্কার সুযোগও কয়েকদিন পাওয়া গেছে। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ তাআলার ওহি বিষয়টিকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিলো যে দুধের জায়গায় দুধ আর পানির জায়গায় পানিই থেকে গেলো।

এটার সম্ভাবনা রয়েছে যে (নাউযুবিল্লাহ) রাসুল ও নবীর স্ত্রীর মাধ্যমে ব্যভিচার সংঘটিত হয়। কারণ, নবীর মতো তাঁর স্ত্রীকেও নিষ্পাপ হতে হবে এমন শর্ত নেই। কিন্তু এটা অসম্ভব যে এ-ধরনের কাজ করার পর সে নবীর স্ত্রীই থাকে এবং আল্লাহর ওহি নবীকে তাঁর সেই স্ত্রীর চরিত্রহীনতা সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন রাখে।

কুফরি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় অপরাধ ও গুনাহের কাজ। কিন্তু তা সামাজিক ও চারিত্রিক আলোচনা-বিবেচনায় চরিত্রহীনতা ও অশ্লীলতা নয়; বরং এটি একটি বিশ্বাস যাকে অপবিশ্বাস বলা যেতে পারে। এ-কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামের কল্যাণসাধন ও সুবিধার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বের কিছু শরিয়তি বিধান বহাল ছিলো; এমনকি স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম মক্কার জীবনে কাফেরদের সঙ্গে বিয়ে-শাদি নিষিদ্ধ করেন নি। অবশ্য মদীনার জীবনে কুরআন মাজিদের স্পষ্ট নির্দেশ মুশরিক ও মুসলমানের মধ্যে বিয়ের সম্পর্ককে চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু ব্যভিচার কোনো অবস্থাতেই এবং কোনো সময়েই জায়েয রাখা হয় নি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কুফরি ও ব্যভিচারকে একসঙ্গে তুলনা করার প্রশ্ন শুদ্ধ হতে পারে না; বরং সামাজিক সৎকর্ম ও মন্দকর্মের স্থায়ীত্ব লাভ ও প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রশ্ন উঠতে পারে। এ-কারণে আমার কাছে হযরত নুহ আ.-এর পবিত্র জীবনের সঙ্গে ব্যাভিচারিণী জীবনসঙ্গিনীর সম্পর্ক থাকা অসম্ভব ব্যাপার ছিলো। যদি নুহ আ.-এর স্ত্রী একবারও ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন, আল্লাহর ওহি তা নবীকে অবহিত করে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতো। অথবা কমপক্ষে একনিষ্ঠ তওবার পর্যায়ে গিয়ে বিষয়টির সমাপ্তি ঘটতো। আমি তার চেয়েও সামনে অগ্রসর হয়ে এই দুঃসাহস পোষণ করছি যে, যদি—আল্লাহ্ না করুন—কোনো একটি বর্ণনাতেও এ-জাতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যেতো তাহলে আমার ওপর ফরজ হতো তার বিশুদ্ধ মীমাংসা অনুসন্ধান করে মূল সত্যকে সামনে উপস্থিত করা। অথচ কুরআন মাজিদ এ-সম্পর্কে কিছুই বলে না এবং হাদিস বা সীরাতের কোনো একটি সহিহ বা দুর্বল রেওয়ায়েতেও এ-সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই। তাহলে অযথা এ-ধরনের দূরবর্তী অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ, মধ্যপন্থাবলম্বী, পক্ষীয় ও বিপক্ষীয় মানুষের মন ও মগজে ভুল চিত্র অঙ্কিত করার মাধ্যমে ক্ষতি আর ভ্রান্তি ছাড়া কী অর্জিত হতে পারে?

সারকথা, বিশুদ্ধ অভিমত এটাই যে, কিনআন হযরত নুহ আ.-এর পুত্র ছিলো। কিন্তু তার ওপর নুহ আ.-এর দাওয়াত ও নসিহতের পরিবর্তে তার কাফের মায়ের প্রতিপালন এবং মাতুলবংশের এবং সেই সম্প্রদায়ের পরিবেশ-পরিস্থিতিই খারাপ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। ফলে কিনআন নবীর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও কাফেরই রয়ে গেলো।

پسر نوح بابداں بنشست   خاندان نبوتش گم شد

নুহ আলাইহিস সালাম-এর পুত্র বদ (কাফের) লোকদের সঙ্গে ওঠাবসা করতো। কাজেই, তার নবীর বংশসুলভ প্রভাব হারিয়ে গেলো। (সে কাফেরই রয়ে গেলো।)

নবী ও পয়গাম্বরের দায়িত্ব হলো শুধু সত্যে ও সৎপথের বাণী পৌছে দেয়া। নিজের সন্তান, স্ত্রী, পরিবার, বংশ ও সম্প্রদায়ের ওপর জবরদস্তি করা এবং তাদের অন্তরকে পরিবর্তন করা নবীদের কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

'তুমি তাদের (কাফেরদের) কর্মবিধায়ক নও।' [সূরা গাশিয়া : আয়াত ২২]

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ

'তুমি তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী নও।' [সূরা কাফ : আয়াত ৪৫]

ইতিহাসবিদগণ হযরত নুহ আ.-এর পুত্রের নাম কিনআন বলে উল্লেখ করেছেন। এটা তাওরাতের রেওয়ায়েতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআন মাজিদ তার নাম উল্লেখ করে নি; মূল ঘটনার প্রয়োজনও ছিলো না।

কতগুলো আনুষাঙ্গিক বিষয়

এক.

হযরত নুহ আ.-এর প্লাবন পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট অংশে সংঘটিত হয়েছিলো না-কি গোটা পৃথিবীর ওপর?—বিশ্বের যাবতীয় ধর্মের ইতিহাস এবং ভূতত্ত্ব বিদ্যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে এই ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

তাওরাত ছাড়াও প্রাচীন হিন্দু ধর্মের (সনাতন ধর্ম) গ্রন্থসমূহেও এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যদিও কুরআন মাজিদের বর্ণিত সাদাসিধে ও পরিষ্কার ঘটনাবলির বিপরীতে অন্য গ্রন্থসমূহের ঘটনাবলিতে কিছুটা অসামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তারপরও মূল ঘটনার বর্ণনায় যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে।

মাওলানা সাইয়িদ আবু নাসর আহমদ হুসাইন ভূপালী তাঁর রচিত 'তারিখুল আদাবিল হিন্দ' গ্রন্থে ঘটনাটির বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।[৩২] তিনি এর শিরোনাম দিয়েছেন— 'ব্রাহ্মণা দাও বা-ইশা'; এতে হযরত

---

[৩২] দেখুন : পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫।

নুহ আ.-কে মনু[৩৩] বলা হয়েছে। মনুর অর্থ হলো ব্রহ্মার পুত্র বা খোদার পুত্র। বা মানববংশের আদিপিতা।

দুই.

কুরআন মাজিদ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে যে হযরত নুহ আ. সাড়ে নয়শত বছর তাঁর কওমের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব পালন করেছেন—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (سورة العنكبوت)

'আমি তো নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলো পঞ্চাশ কম হাজার বছর। এরপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে; কারণ তারা ছিলো সীমালঙ্ঘনকারী। [সুরা আনকাবুত : আয়াত ১৪]

তাঁর এই বয়স বর্তমান সময়ের স্বাভাবিক বয়সের তুলনায় বিবেক ও জ্ঞানবহির্ভূত বলে মনে হয়; কিন্তু তা অসাধ্য বা অসম্ভব কিছু নয়। কারণ মানব-সৃষ্টির প্রাথমিক কালে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা এবং রোগ ও ব্যাধির এত প্রকোপ ছিলো না। কয়েক হাজার বছরের মধ্যে মানব সভ্যতার তৈরিকৃত উপকরণসমূহ দুশ্চিন্তা ও রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি করেছে। আর প্রাচীনকালের ইতিহাসও স্বীকার করছে যে কয়েক হাজার বছর আগে মানুষের স্বাভাবিক বয়সের গড় বর্তমান বয়সের গড় অপেক্ষা অনেকগুণ বেশি ছিলো। তা ছাড়া হযরত নুহ আ.-এর বয়সের বিষয়টি ওইসব ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়গুলোর অন্যতম যা আম্বিয়া কেরামের ইতিহাসে আল্লাহর দান এবং আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য। এর হেকমত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন।

কুরআন মাজিদ কোনো নবী বা রাসুলের দাওয়াত ও তাবলিগের সময়সীমা এমনভাবে বর্ণনা করে নি যেভাবে হযরত নুহ আ.-এর ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগের দীর্ঘায়ুর ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রেক্ষিতে যদি তা (হযরত নুহ আ.-

---

[৩৩] হিন্দু পুরাণ মতে ব্রহ্মার চতুর্দশ পুত্র—বৈবস্বত মনু: আদি মানব।

এর দীর্ঘ বয়স) মেনে নেয়া হয় তবে তার পূর্ণ অবকাশ রয়েছে। আর যদি ইতিহাসের এসব সাক্ষ্য-প্রমাণকে সত্য মনে না করে সেগুলোকে অস্বীকার করা হয়, তারপরও এই ঘটনাটিকে বিশেষ বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে আল্লাহর বিশেষ দান বুঝতে হবে, যা একজন নবী ও রাসুলের দাওয়াত ও তাবলিগের হেকমতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রকৃত ও বিশুদ্ধ বক্তব্য এটাই। আর নুহ আ.-এর বয়সের সময়সীমা কমানোর জন্য অবান্তর অপব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই।

বিখ্যাত কবি আবুল আলা মাআররি তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতায় বর্ণনা করেছেন, প্রাচীন কালে এই প্রথা ছিলো যে মানুষ عام ও سنة (বছর) শব্দ ব্যবহার করে 'شهر' (মাস) অর্থ গ্রহণ করতো। কবির এই বক্তব্য অনুসারে কোনো কোনো ঐতিহাসিক ধারণা করেছেন যে হযরত নুহ আ. দাওয়াতি খেদমতের বয়স আশি বছর হয়েছিলো। আর তাঁর মোট আয়ুষ্কাল দেড়শত বছরের অধিক নয়। কিন্তু তা সত্য নয়। কারণ আবুল আলা মাআররির এই বক্তব্যকে যদি সত্য বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এটাকে আরবের কোনো এক অখ্যাত হিসাবের কথা বলে মনে করা হবে। কারণ কুরআন মাজিদ নাযিল হওয়ার সময় আরবের কোনো গোত্র সম্পর্কে এ-কথা প্রমাণিত নেই যে তারা عام ও سنة (বছর) শব্দ দুটি বলে 'شهر' (মাস) অর্থ গ্রহণ করছে। সুতরাং কুরআন মাজিদের বর্ণিত বক্তব্যের ওপর আবুল আলা মাআররির বক্তব্য প্রযোজ্য হতে পারে না।

তা ছাড়া, সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, কুরআন মাজিদ যেভাবে এই বয়সসীমা বর্ণনা করেছে, তাতে পরিষ্কার বুঝা যায় তা নুহ আ.-এর দাওয়াত ও তাবলিগের অনন্য সময়সীমা প্রকাশ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। তা ছাড়া কুরআন মাজিদের নিয়ম হলো একান্ত গুরুতর প্রয়োজন ছাড়া এ-ধরনের খুঁটিনাটি ঘটনা ও অবস্থা খুব কমই বর্ণনা করে থাকে।

তিন.

কোনো কোনো মুফাস্সির ইসরাইলি (অর্থাৎ বিকৃত তাওরাত ও ইহুদিদের রচিত) রেওয়ায়েতসমূহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে নুহ আ.-এর প্লাবনের চল্লিশ বছর আগ থেকেই নুহ আ.-এর সম্প্রদায়ের নারীদেরকে

বন্ধ্যা করে দেয়া হয়েছিলো। যাতে এই সময়ের মধ্যে নতুন কোনো বংশ পৃথিবীতে না আসে। কিন্তু এ-রেয়ায়েতটি গল্পগুজবের বেশি কিছু নয়। সম্ভবত এ-রেওয়ায়েতটি এ-জন্য বানিয়ে নেয়া হয়েছে যাতে এ-ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত না হয় যে—হযরত নুহ আ.-এর গোটা সম্প্রদায়কে যদি ব্যাপক প্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে শিশুদের কী দোষ ছিলো যে তাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে?

যাঁরা এই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন তাঁরা সম্ভবত এ-সম্পর্কে আল্লাহর নীতিমালা (যাকে সুন্নাতুল্লাহ বলা হয়) কী তা ভুলে গেছেন। অন্যথায় তাদের এ-ধরনের অর্থহীন রেওয়ায়েত বর্ণনা করার প্রয়োজন হতো না। এসব রেওয়ায়েত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহুদিদের অবাস্তব চিন্তা ও ভুল বিশ্বাসপ্রসূত হয়ে থাকে।

অস্তিত্বের জগতে আল্লাহ তাআলার এই নীতি প্রচলিত আছে যে, যখনই কোনো কারণে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, তুফান, প্লাবন ও ভূমিকম্পের মতো বিষয়গুলো আবির্ভূত হয়;—চাই তা শাস্তির উদ্দেশ্যে হোক বা জীবনের সাধারণ অবস্থাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বাহ্যিক কারণে আবির্ভূত হোক—যেখানেই এ-ধরনের শাস্তি বা বিপদাপদ আবির্ভূত সেখানে সৎকর্মপরায়ণ ও পাপাচারী, ওলি ও শয়তান, যাহেদ ও আবেদ এবং গুনাহগার ও বদকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। বরং তা স্বাভাবিক কারণগুলোর প্রেক্ষিতে ফলাফল প্রকাশ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট আর পার্থিব জীবনের বিবেচনায় তাদের গ্রাসে এমন প্রত্যেক মানুষই এসে যারা কোনো-না-কোনো কারণে উল্লিখিত কারণসমূহের আওতাভুক্ত হয়েছে।

অবশ্য পরকালের হিসেবে এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে পাপাচারী, অবাধ্য, নাফরমান ও আল্লাহর শত্রুদের জন্য তা আল্লাহর শাস্তি ভোগের কারণ হয়ে যায়; আর আনুগত্যশীল, সৎকর্মপরায়ণ ও নেক বান্দাদের জন্য সৌভাগ্য ও উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হয়।

আমাদের চোখ কি এটা অহরহ দেখে না যে ভূমিকম্প সংঘটিত হলে সৎ মানুষ ও পাপাচারী সবার ওপরই একই ধরনের ক্রিয়া করে থাকে। মহামারী বিস্তার লাভ করলে ভালো মানুষ আর খারাপ মানুষ উভয়ই তার আক্রমণের আওতায় এসে যায় এবং সবার জীবনের জন্য তা সমানভাবে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়।

অবশ্য এ-কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে কোনো নবী ও পয়গাম্বরের প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের অব্যাহত নাফরমানি ও অবাধ্যচারের কারণে এ-জাতীয় ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ হলে আগেভাগেই ওহির মাধ্যমে নবীকে জানিয়ে দেয়া হয়। নবীর প্রতি আল্লাহর আদেশ জারি হয় যে তিনি তাঁর অনুগত উম্মতকে—যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন—সঙ্গে নিয়ে সেই শাস্তির বসতি থেকে বের হয়ে যান এবং যেনো উচ্চৈঃস্বরে এ-কথা ঘোষণা করেন—হে আমার সম্প্রদায়, হয় আমার প্রচারিত আল্লাহর বিধানাবলির সামনে মস্তক অবনত কর অথবা আল্লাহর প্রেরিত আযাব গ্রহণ করো। এভাবে মুমিনগণ সেই শাস্তির আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকেন।

যাইহোক, মুফাস্‌সিরগণ যে-সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মনগড়া ইসরাইলি রেওয়ায়েতের ভাণ্ডার থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতে চাইছেন তা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

মোটকথা, হযরত নুহ আ.-এর প্লাবনে স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, বালক-বালিকা সবাই ধ্বংসক্রিয়ার শিকার হয়ে গেলো। আর কুফরি জগতের সেই অংশটুকু সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস করে দেয়া হলো।

এখন এই বিষয়টি আল্লাহ তাআলার হাতে ন্যস্ত থাকলো যে যেসব জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক মানুষ নাফরমানি করেছিলো, এই শাস্তিই তাদের জন্য চিরকালীন শাস্তিরূপে স্থায়ী হবে। আর যারা নিষ্পাপ ও অবোধ ছিলো তারা পরকালের শাস্তির থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে।

চার.

প্লাবনের পর হযরত নুহ আ.-এর নৌকা কোন জায়গায় থামলো? তাওরাতে সেই স্থানটির নামা আরারাত (এরারুট) বলা হয়েছে। হযরত নুহ আ.-এর দাওয়াত ও তাবলিগের কার্যাবলি সেই এলাকার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলো যা দজলা ও ফোরাত নদী দুটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই নদী দুটি আরমেনিয়া পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং পৃথক পৃথকভাবে প্রবাহিত হয়ে ইরাকের নিম্নাঞ্চলে এসে পরস্পর মিলিত হয়েছে। তারপর পারস্য উপসাগরে গিয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। আরমেনিয়ার এই পাহাড়টি আরারাত অঞ্চলে অবস্থিত। এ-কারণেই তাওরাতে একে আরারাত পাহাড় বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজিদে

সম্পূর্ণ এলাকাটির পরিবর্তে কেবল নির্দিষ্ট স্থানটির উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে গিয়ে নুহ আ.-এর নৌকা থেমেছিলো। তা হলো জুদি। তাওরাতের ব্যাখ্যাকারীদের ধারণা এই যে, জুদি সেই প্রর্বতশ্রেণির নাম যা আরারাত ও জর্জিয়ার পর্বতমালা দুটিকে পরস্পর মিলিয়ে দিয়েছে। তাঁরা এটাও বলে থাকেন যে, মহাবীর আলেকজান্ডারের সময়কার গ্রিক লিপিগুলোও উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যায়ন করছে। আর এই ঐতিহাসিক সত্যটি তো অস্বীকার করা যায় না যে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সেখানে একটি উপসনাগৃহ ও প্রতিমূর্তি বিদ্যমান ছিলো। এটিকে 'নৌকার উপসনাগৃহ' নামে আখ্যায়িত করা হতো।

পাঁচ.

একজন মুফাস্‌সির হযরত নুহ আ.-এর পুত্র কিনআনের মুক্তি না পাওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছেন। তার সারমর্ম হলো, হযরত নুহ আ. উচ্চ মর্যাদাবান নবী ছিলেন; তাঁর দোয়া কবুল করা হতো। তিনি দোয়া ও বদদোয়া উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর পুত্রের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে কাফের পুত্রের অবাধ্যতা কর্মফলের আকারে প্রকাশিত হয়েছিলো এবং সেও ধ্বংসমান কাফেরদের সঙ্গে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো।

অবশেষে যখন হযরত নুহ আ. তাঁর সম্প্রদায়কে সৎপথে আনয়নে অক্ষম হয়ে পড়লেন তখন তিনি সর্বপ্রথম এই দোয়া করলেন—

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا () إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (سورة نوح)

'হে আমার প্রতিপালক, পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্যে থেকে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফের।' (তারা তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে থাকবে এবং তাদের সন্তানেরাও কুফরি ও পথভ্রষ্টতার ওপরই বহাল থাকবে।) [সুরা নুহ : আয়াত ২৬-২৭]

তিনি এ-কথা একেবারেই ভুলে গেলেন যে বদদোয়ার মধ্যে কেনানকে বাদ রেখে তার হেদায়েত কবুল হওয়ার দোয়া করা উচিত ছিলো অথবা তখন পর্যন্ত তিনি তাঁর পুত্রের কুফরি সম্পর্কে অবগতই ছিলেন না।

হযরত নুহ আ. দ্বিতীয়বার আল্লাহ তাআলার দরবারে এই দোয়া করেছিলেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (سورة نوح)

'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করে দাও।' [সুরা নুহ : আয়াত ২৮]

এখানে তিনি কিনআনকে বাদ রাখেন নি; বা পুত্রের ঈমান আনার পর তাঁর পরিবারভুক্ত হওয়ারও দোয়া করেন নি।

তৃতীয়বার তিনি আবার এই প্রার্থনা করলেন—

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

'আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করো।' [সুরা নুহ : আয়াত ২৮]

কিনআন জালিম ছিলো। কারণ সে ছিলো কাফের। এখানেও সুযোগ ছিলো কিনআনকে বাদ দিয়ে তার জন্য এই দোয়া করা যে সে যেনো জালিম না থেকে মুমিন হয়ে যায়। আর যদি এমন হয়, পুত্রের কুফর সম্পর্কে নুহ আ. জ্ঞাত ছিলেন না, তাহলে বলতে হবে যে এটা তাঁর হতভাগ্য ছেলের দুর্ভাগ্য। আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে এমনই স্থিরীকৃত হয়েছিলো।

এরপর যখন হযরত নুহ আ.-এর দোয়া কবুল হওয়ার সময় এলো এবং কিনআন রীতিমত অবাধ্যই থেকে গেলো, তখন পুত্রস্নেহের আবেগের উচ্ছ্বাস আল্লাহ তাআলার ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার সামনে স্থির থাকতে পারলো না। তিনি পুত্রের মুক্তির জন্য প্রর্থনা করলেন এবং এর জন্য নিজের অজ্ঞতা স্বীকারের সঙ্গে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হলো। তিনি এত বিশাল মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহপাকের সামনে গভীর আনুগত্য প্রকাশ করাই শ্রেয় মনে করলেন এবং খাঁটি ও পূর্ণ বান্দা হওয়ার প্রমাণ পেশ করলেন। ফলে তিনি আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে ক্ষমা পেলে এবং আল্লাহর নৈকট্যের মর্যাদা লাভ করলেন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

এক.

প্রতিটি মানুষকে নিজের কার্যকলাপ ও কর্মকাণ্ডের জন্য নিজেকেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং পিতার মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার মাধ্যমে পুত্রের পাপের প্রতিকার হতে পারে না এবং পুত্রের নেক আমল ও পারলৌকিক সৌভাগ্য পিতার অবাধ্যাচরণের বিনিময় বা বদলা হতে পারে না। হযরত নুহ আ.-এর নবুওত তাঁর পুত্র কিনআনের কুফরির শাস্তি ঠেকাতে পারে নি এবং হযরত ইবরাহিম আ.-এর নবুওত ও উচ্চ মর্যাদা পিতা আযারের শিরক থেকে মুক্তির জন্য কারণ হতে পারে নি।

كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه

'প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ পদ্ধতিতে কাজ করছে।' [সুরা আল-ইসরা : আয়াত ৮৪]

দুই.

অসৎসঙ্গ হলাহল বিষ থেকেও অধিক মারাত্মক। এর প্রতিফল ও পরিণাম অপমান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়। মানুষের জন্য ভালো কাজ ও সৎকর্ম যেমন আবশ্যক, তার চেয়েও বেশি আবশ্যক ভালো মানুষের সংসর্গ। অন্যদিকে খারাপ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা মানুষের জীবনের একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। তার চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় হলো অসৎসঙ্গ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। কবি বলেছেন—

پسر نوح باداں بنشست　　خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کهف روزے چند　　پے نیکاں گرفت مردم شد

صحبت صالح ترا صالح کند　　صحبت طالح ترا طالح کند

নুহ আ.-এর পুত্র পাপাচারীদের (কাফেদের) সঙ্গে ওঠাবসা করেছে, ফলে সে নবীবংশের মর্যাদা খুইয়েছে। (নবীবংশে জন্মলাভ করা তার কোনো কাজে আসে নি।)

আসহাবে কাহফের কুকুর কিছুদিন সৎ মানুষদের সংসর্গ লাভ করে মানুষ (এর মতো মর্যাদাশীল) হয়ে গেছে।

সৎ মানুষের সংসর্গ তোমাকে সৎ বানিয়ে দেয় আর পাপাচারীর সংসর্গ তোমাকে পাপাচারী বানিয়ে দেয়।'

তিন.

আল্লাহ তাআলার ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর ও ভরসা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক উপকরণের ব্যবহার তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। বরং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের জন্য এটা সঠিক পন্থা। এ-কারণেই নুহ আ.-এর প্লাবন থেকে বাঁচার জন্য নুহ আ.-এর নৌকার প্রয়োজন হয়েছিলো।

চার.

আল্লাহ তাআলার নবী ও রাসুলগণ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও মানবীয় স্বভাবসুলভ কারণে তাঁদের পদস্খলন ঘটতে পারে বা ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে; কিন্তু তারা সেই ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর স্থায়ী থাকেন না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয় এবং সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তাঁদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়া হয়। হযরত আদম আ. এবং হযরত নুহ আ.-এর ঘটনাগুলো এই বক্তব্যের সত্য সাক্ষ্য। তা ছাড়া তাঁরা অদৃশ্য সম্পর্কিত জ্ঞানেরও অধিকারী নন। যেমন এই ঘটনায় হযরত নুহ আ.-কে আল্লাহ বলেছেন, "আমার কাছে এমন বিষয়ের সুপারিশ করো যে-সম্পর্কে তুমি অবগত নও।" এতেই পরিষ্কারভাবে উপরিউক্ত কথাটি বুঝা যায়।

পাঁচ.

কর্মফল-সম্পর্কিত আল্লাহর নীতিমালা যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রে তার কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু এটা জরুরি নয় যে প্রতিটি অপরাধের শাস্তি এবং প্রতিটি ভালো কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই পাওয়া যাবে। কারণ এই বিশ্বজগৎ কর্মক্ষেত্র। আর কর্মফলের জন্য পরকালকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারপরও জুলুম ও অহংকার এই দুটি পাপকাজের শাস্তি কোনো-না-কোনোভাবে এখানে দুনিয়াতে অবশ্যই পেয়ে যায়।

ইমাম আবু হানীফা রহ. বলতেন, জালিম ও অহংকারী লোকেরা তাদের মৃত্যুর পূর্বেই নিজেদের জুলুম ও অহংকারের কিছু-না-কিছু শাস্তি পেয়ে যায় এবং লাঞ্ছনা ও বিফলতার মুখোমুখী হয়। যেমন, আল্লাহ তাআলার সত্য নবীদেরকে কষ্ট প্রদানকারী সম্প্রদায়সমূহ এবং ইতিহাসে উল্লিখিত জালিম ও অহংকারীদের ধ্বংসলীলার কাহিনিসমূহ উপরিউক্ত বক্তব্যে উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

হযরত ইদরিস আলাইহিস সালাম

কুরআন মাজিদে হযরত ইদরিস আ.-এর আলোচনা

কুরআন মাজিদের দুই জায়গায় হযরত ইদরিস আ.-এর উল্লেখ করা হয়েছে: সুরা মারইয়ামে ও সুরা আম্বিয়াতে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا () وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (سورة مريم)

'স্মরণ করো এই কিতাবে (কুরআন মাজিদে) ইদরিসের কথা, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, নবী; এবং আমি তাঁকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।' [সুরা মারইয়াম : আয়াত ৫৬-৫৭]

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (سورة الأنبياء)

'এবং স্মরণ করো ইসমাইল, ইদরিস ও যুল-কিফল-এর কথা; তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল।' [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৫]

নাম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইদরিস আ.-এর নাম ও বংশ পরিচয় এবং তা সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কঠিন মতভেদ রয়েছে। মতভেদকারীদের সব ধরনের বক্তব্য সামনে রেখেও কোনো প্রকার মীমাংসিত বিষয় বা অন্তত পক্ষে কোনো প্রবল অভিমত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ, কুরআন মাজিদ তো হেদায়েত ও নসিহতের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ থেকে কেবল তাঁর নবুওত, উচ্চ মর্যাদা ও মহৎ গুণাবলির কথা উল্লেখ করেছে। আর এমনিভাবে হাদিসের বর্ণনাগুলো এর বেশি অগ্রসর হয় না। সুতরাং, এ-সম্পর্কে যা কিছু পাওয়া যায় সব ইসরাইলি রেওয়ায়েত। সেগুলোও আবার পরস্পর বিরোধী ও মতানৈক্যে পরিপূর্ণ। একদল বলেন, তিনি নুহ আ.-এর দাদা, তাঁর নাম আখনুখ এবং ইদরিস তাঁর উপাধি। অথবা আরবি ভাষায় ইদরিস এবং হিব্রু ও সুরিয়ানি ভাষায় তাঁর নাম আখনুখ এবং তাঁর বংশপরিচয় নিম্নরূপ—খানুখ বা আখনুখ (ইদরিস) বিন ইয়ারুদ বিন মাহলাইল বিন কীনান বিন আনুশ বিন শীশ আ. বিন আদম আ.। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে ইসহাকের প্রবল মত এটাই।

অপর একদল বলেন, ইদরিস আ. বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত নবীগণের মধ্য থেকে ছিলেন। আর ইদরিস আ. ও ইয়াকুব আ. একই ব্যক্তির নাম ও উপাধি। এই দুই (দলের) রেওয়ায়েতকে সামনে রেখে কয়েকজন আলেম তাদের মধ্যে এইভাবে সমাঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেছেন যে নুহ আ.-এর দাদার নাম আখনুখ এবং ইদরিস তার উপাধি। আর বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত নবীর নাম ইদরিস আ. এবং ইলয়াস তাঁর উপাধি। কিন্তু সামঞ্জস্যবিধানের এই অভিমতটি সূত্রবিহীন ও প্রমাণবিহীন। তা ছাড়া কুরআন মাজিদ ইদরিস আ. ও ইলয়াস আ.-কে ভিন্ন ভিন্ন নবী হিসেবে বর্ণনা করেছে। ফলে এই অভিমতটি সত্য হতে পারে না।[৩৪]

সহিহ ইবনে হিব্বানে রেওয়ায়েত আছে যে হযরত ইদরিস আ. সর্বপ্রথম কলম ব্যবহার করেছিলেন।[৩৫] একটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইলমে রামলের নকশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি জবাব দিলেন, জনৈক নবীকে এই ইলম দান করা হয়েছিলো। সুতরাং, কোনো ব্যক্তি অঙ্কিত নকশা যদি সেই নকশার মতো হয়ে যায় তবেই তা সঠিক হবে; অন্যথায় নয়।[৩৬]

হাফেজে হাদিস ইমাদুদ্দিন বিন কাসির (ইবনে কাসির) এ সকল রেওয়ায়েতের সঙ্গে এটাও উল্লেখ করেছেন যে তাফসির ও আহকামের অনেক আলেম এটা দাবি করেছেন—হযরত ইদরিস আ. সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি রামলের পূর্ণ ব্যাখ্য প্রদান করেছিলেন। তাঁরা হযরত ইদরিস আ.-কে 'হারমাসুল হারামিসা' (هرمس الهرامسة) অর্থাৎ প্রাথমিক জ্যোতির্বিদগণের সর্বপ্রথম শিক্ষকের হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

---

[৩৪] হযরত ইদরিস আ. সম্পর্কিত আরো মতবিরোধপূর্ণ আলোচনা পাঠ করতে দেখুন : ইবনে হাজার আসকালানি রচিত 'ফাতহুল বারি', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮ এবং হাফেজে হাদিস ইমাদুদ্দিন বিন কাসির (ইবনে কাসির) রচিত ইতিহাসগ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭। -লেখক

[৩৫] এটি আবু যর গিফারি রা. বর্ণিত হাদিস। মূল বাক্য : وهو إدريس وهو اول من خط بالقلم। দেখুন সহিহ ইবনে হিব্বান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯।

[৩৬] মূল হাদিস : عن معاوية بن الحكم السلمي لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل فقال: " إنه كان نبي يخط به فمن وافق خطه فذاك। দেখুন : 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১।

তাফসির ও আহকামের উলামাদের পক্ষ থেকে হযরত ইদরিস আ.-এর প্রতি অনেক বিষয়ের মিথ্যারোপ করা হয়েছে, যেমন অনেক নবী ও ওলি সম্পর্কে মিথ্যা উক্তি করা হয়ে থাকে।[৩৭]

সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফে মিরাজের হাদিসে শুধু এইটুকু উল্লেখ আছে যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরিস আ.-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

কিন্তু বিখ্যাত মুফাস্সির ইবনে জারির তাবারি তাঁর তাফসিরে হিলাল কিন ইয়াসাফের সূত্রে একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত ইদরিস আ. সম্পর্কে কুরআন মাজিদে যে উল্লেখ আছে— وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا 'আর আমি তাঁকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছি—এর অর্থ কী? কা'ব আহবার জবাবে বললেন, আল্লাহ তাআলা একবার হযরত ইদরিস আ.-এর প্রতি ওহি নাযিল করলেন—হে ইদরিস, গোটা দুনিয়াবাসী দৈনিক যে-পরিমাণ আমল করবে, আমি তোমাকে প্রত্যেকদিন সে-সমস্ত আমলের সমান সওয়াব দান করবো। হযরত ইদরিস আ. আল্লাহর এই বাণী শোনার পর তাঁর মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষার উদয় হলো যে, আমার আমল যেনো প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার জন্য আমার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়ে গেলেই ভালো হয়। তিনি আল্লাহ তাআলার ওহি এবং তাঁর নিজের এই বাসনা তাঁর এক ফেরেশতা বন্ধুর কাছে প্রকাশ করে বললেন, এই ব্যাপারে মৃত্যুর ফেরেশতার সঙ্গে আলোচনা করুন, যেনো আমি নেক আমল ও সওয়াব বাড়ানোর জন্য বেশি থেকে বেশি সুযোগ পাই। বন্ধু ফেরেশতা এ-কথা শুনে হযরত ইদরিস আ.-কে নিজের ডানার ওপর বসিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁরা যখন চতুর্থ আসমানের উপর দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, ঠিক সেই সময় মালাকুল মাওত জমিনের দিকে অবতরণ করছিলেন। চতুর্থ আসমানেই তাঁদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। বন্ধু ফেরেশতা মালাকুল মাউতকে হযরত ইদরিস আ.-এর বাসনা সম্পর্কে অবগত করলেন। মালাকুল মাউত জিজ্ঞেস করলেন, ইদরিস এখন কোথায়? বন্ধু ফেরেশতা বললেন, আমার ডানার ওপর

[৩৭] দেখুন : 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১।

আরোহণ করে আছেন। মালাকুল মাউত বললেন, আমি তো চতুর্থ আসমানে তাঁর রুহ কব্জ করার জন্য আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছি। এ-কারণে আমি কঠিন অস্থিরতা ও বিস্ময়বোধের মধ্যে ছিলাম যে এটা কীভাবে সম্ভব হবে, যখন ইদরিস আ. রয়েছেন জমিনে। সেই মুহূর্তেই মালাকুল মাউত হযরত ইদরিস আ.-এর রুহ কব্জ করে নিলেন।

এই ঘটনাটি বর্ণনা করে কা'ব আহবার বলেন, আল্লাহ তাআলার— وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا 'আমি তাঁকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছি'—কথাটির তাফসির এটাই।[৩৮] ইবনে জারিরের মতো ইবনে আবি হাতেমও তাঁর তাফসিরে এই ধরনের রেওয়ায়েতই বর্ণনা করেছেন।

এই দুটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর হাফেজ ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. বলেন, এগুলো যাবতীয়ই মিথ্যা মনগড়া ইসরাইলি রচনা। এগুলোর মধ্যে রেওয়ায়েত হিসেবেও গ্রহণ-অযোগ্য অনেক অদ্ভুদ বর্ণনা আছে। সুতরাং বিশুদ্ধ তাফসির তাই যা আয়াতটির তরজমায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি রহ. বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে নবী ইলয়াস আ.-এর নামই ইদরিস আ.। ইমাম বুখারির এই উক্তির কারণ হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত সেই হাদিস যা ইমাম যুহরি রহ. মিরাজ-প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম)-এর আসমানে সাক্ষাতের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হযরত ইদরিস আ.-এর সঙ্গে যখন নবী করী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাৎ হলো, তখন ইদরিস আ. বললেন, مرحبا بالأخ الصالح 'হে আমার নেককার ভাই, তোমার আগমন শুভ হয়েছে।' সুতরাং, হযরত ইদরিস আ. যদি আখনুখ হতেন, তাহলে হযরত আদম ও হযরত ইবরাহিম আ.-এর মতো তিনিও بالابن الصالح 'নেককার বেটা, (তোমার আগমন শুভ হয়েছে) বলতেন।

---

[৩৮] দেখুন : জামিউল বায়ান, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪।

অর্থাৎ তিনিও 'নেককার ভাই' বলার পরিবর্তে 'নেককার বেটা' বলতেন। এই রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসির রহ. বলেন, এই প্রমাণটি দুর্বল। কেননা, প্রথমত এই সম্ভাবনা রয়েছে যে দীর্ঘ হাদিসটিতে বর্ণনাকারী হয়তো শব্দগুলো পরিপূর্ণভাবে স্মরণ রাখতে পারেন নি; এবং দ্বিতীয়ত, এটাও সম্ভব যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অতি উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো তিনি পিতৃত্বের সম্পর্কটি প্রকাশ করেন নি এবং বিনয়স্বরূপ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কই প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করেছেন। কিন্তু হযরত আদম আ. ও হযরত ইবরাহিম আ.-এর বেলায় কথা হলো—তাঁদের একজন ছিলেন আবুল বাশার (মানবজাতির আদি পিতা) এবং অপরজন ছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ মর্যাদাবান নবী। যাঁর সম্পর্কে কুরআন মাজিদ ঘোষণা করেছে— فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا 'তোমরা সবাই (অন্যান্য সব বাতিল মতবাদ পরিত্যাগ করে) একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের ধর্মের অনুসরণ করো।'[৩৯] সুতরাং, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁদের দুইজনের 'পুত্র' বলে সম্বোধন করা সবদিক থেকেই সমীচীন হয়েছে।

ইমামুদ্দিন বিন কাসির রহ. এটাও বর্ণনা করেছেন যে, কেউ কেউ বলেন, হযরত ইদরিস আ. হযরত নুহ আ.-এর পূর্বের নবী নন; বরং তিনি বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত নবীগণের মধ্যে একজন নবী এবং ইলয়াস আ.-ই ইদরিস আ.।

তাওরাতে এই মর্যাদাশীল নবী সম্পর্কে শুধু এতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে— "আর হানুক (আখনুখ) ৬৫ বছর বয়সে পদার্পণ করলে তাঁর ঔরসে মুতাওশালেহ জন্মগ্রহণ করেন। তারপর হানুক তিনশো বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার দীনের খেদমত করেছেন। হানুকের ঔরসে আরো অনেক পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং, হানুকের পরিপূর্ণ বয়স হয়েছিলো তিনশো পঁয়ষট্টি বছর। এই সময় তিনি আল্লাহর সঙ্গে চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যান। কারণ, আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নেন।"[৪০]

---

[৩৯] সুরা নিসা : আয়াত ১২৫।

[৪০] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায় : পঙ্‌ক্তি ২১-২৪।

বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে হযরত ইদরিস আ.

আল্লামা জামালুদ্দিন কাতফি রহ. তাঁর রচিত 'তারিখুল হুকামা'[৪১] গ্রন্থে লিখেছেন, 'মুফাস্সির ও ইতিহাসবিদগণ যেসব কথা লিখেছেন সেগুলো খুবই প্রসিদ্ধ কথা। সুতরাং সেগুলোর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। অবশ্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে যা-কিছু বর্ণনা করেছেন তা-ই নিচে উদ্ধৃত করা হলো।

হযরত ইদরিস আ.-এর জন্মস্থান ও তাঁর প্রতিপালিত হওয়ার স্থান কোথায় এবং তিনি নবুওতপ্রাপ্তি আগে কার কাছ থেকে বিদ্যা অর্জন করেছেন—এ-সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মত বিভিন্ন প্রকার।

একদলের মতে, হযরত ইদরিস আ.-এর নাম ছিলো 'হারমাসুল হারামিসা'। তিনি মিসরের 'মানাফ' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রিকরা 'হারমাস'কে 'আরমিস' বলে। আরমিস শব্দের অর্থ বুধ গ্রহ। (আরমিস অথবা হারমিস গ্রিসের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। এ-কারণেই তাঁকে আরমিস বলা হতো। গ্রিকরা আরমিস ও ইদরিসকে একই ব্যক্তি মনে করে। অথচ এটা একটি প্রকশ্য ভুল। এর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।)

অপর দল মনে করে, তাঁর নাম গ্রিক ভাষায় 'তিরমিস'; হিব্রু ভাষায় 'খানুখ' এবং আরবি ভাষায় 'আখনুখ'। আর কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা তাঁর নাম ইদরিস বলেছেন। আবার একই দল বলে, তাঁর গুরুর নাম ছিলো 'গুসা যাইমুন' বা 'আগুসা যাইমুন' (মিসরি)। 'গুসা যাইমুন' সম্পর্কে এই দল এর চেয়ে বেশি আর কিছুই বলে না যে তিনি মিসরের অর্থ গ্রিসের নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) মধ্য থেকে একজন নবী ছিলেন। আবার এই দলই গুসা যাইমুনকে দ্বিতীয় ইদরিন এবং হযরত ইদরিস আ.-কে তৃতীয় ইদরিন উপাধি দিয়ে থাকে। গুসা যাইমুন শব্দের অর্থ অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ। তাঁরা এটাও বলেন যে হারমাস মিসর থেকে বের হয়ে গোটা ভূ-মণ্ডল ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ করেছেন। এরপর তিনি মিসরে প্রত্যাবর্তন করলে ৮২ বছর বয়সে আল্লাহপাক তাঁকে নিজের সান্নিধ্যে উঠিয়ে নেন।

---

[৪১] গ্রন্থের মূল নাম : المنتخبات الملتقطات من كتاب اخبار العلماء باخبار الحكماء এবং লেখকের নাম : আল্লামা জামালুদ্দিন আবুল হাসান আলি বি ইউসুফ কাতফি।

তৃতীয় আরেকটি দল বলে, ইদরিস আ. বাবেলে (ব্যাবিলনে) জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি প্রতিপালিত হন ও বেড়ে ওঠেন। প্রথম জীবনে তিনি হযরত শীস বিন আদম আ. থেকে বিদ্যা অর্জন করেন। আকায়িদ শাস্ত্রের বিখ্যাত আলেম আল্লামা শাহারেস্তানি বলেন, আগুসা যাইমুন হযরত শীস আ.-এরই নাম।

হযরত ইদরিস আ. জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওত দানে ভূষিত করেন। তখন তিনি দুষ্ট-প্রকৃতি ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদেরকে হেদায়েতের দাওয়াত ও তাবলিগ শুরু করেন। কিন্তু ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও বিস্তারকারীরা তাঁর কোনোও কথায় কান দিলো না। হযরত আদম আ. ও হযরত শীষ আ.-এর শরিয়তের বিরোধীই থেকে গেলো। অবশ্য ক্ষুদ্র একটি দল ইসলাম গ্রহণ করলো। হযরত ইদরিস আ. ওখানে এই ধরনের গতিবিধি ও হাবভাব দেখে ওখান থেকে হিজরত করে অন্য এলাকায় চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। তিনি তাঁর অনুসারীবৃন্দকেও হিজরত করতে বললেন। ইদরিস আ.-এর অনুসারীরা এ-কথা শোনার পর জন্মভূমি পরিত্যাগ করা দুঃসহ ও যন্ত্রণাদায়ক মনে করে বললেন, বাবেল শহরের মতো এমন সুন্দর বাসস্থান আমাদের ভাগ্যে আর কোথাও হতে পারে![৪২]

হযরত ইদরিস আ. তাঁর অনুসারীদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমরা যদি আল্লাহর পথে এই কষ্টটুকু সহ্য করো, তাহলে তাঁর রহমত অতি ব্যাপক, তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই এর উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। সুতরাং তোমরা সাহস হারিও না। আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সামনে নিজেদের মস্তক অবনত করো।

মুসলমানদের সম্মতি লাভের পর হযরত ইদরিস আ. এবং তাঁর অনুসারীগণ মিসরের উদ্দেশে হিজরত করলেন। এই ক্ষুদ্র দলটি যখন নীল নদের প্রবাহ এবং তার পাশের অববাহিকার সবুজ শ্যামালিমা ও সজীব দৃশ্য দেখতে পেলো, উৎফুল্ল ও আনন্দিত হলো। হযরত ইদরিস

---

[৪২] বাবেল শব্দের অর্থ নদী। বাবেল শহর দজলা ও ফুরাত নদী দুটির পানিতে সবুজ ও সজীব ছিলো। এই কারণে একে বাবেল নাম দেয়া হয়েছিলো। বাবেল ইরাকের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত শহর ছিলো; কিন্তু কালের বিবর্তনে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আ. এই দৃশ্য দেখে তাঁর অনুসারীদেরকে বললেন, 'বার্বলিউন'[৪৩] (بابليون) অর্থাৎ এই বিশাল নদীটির অববাহিকা-ভূমি তোমাদের বাবেলের মতোই সবুজশ্যামল ও সজীব। তাঁরা উত্তম স্থান নির্বাচন করে নীল নদের পাশেই বসবাস করতে লাগলেন। হযরত ইদরিস আ. বাবলিউন শব্দটি এতই বিখ্যাত হয়ে পড়লো যে আরব জাতি ছাড়া প্রাচীনকালের সব জাতিই এই ভূখণ্ডটিকে 'বাবলিউন' বলতে শুরু করলো। অবশ্য আরবরা একে বলতো 'মিসর'। মিসর নামকরণের কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন, হযরত নুহ আ.-এর প্লাবনের পর এই জায়গাটি মিসর বিন হামের বংশধরগণের বসবাসস্থল হয়েছিলো।

হযরত ইদরিস আ. ও তাঁর অনুসারী দল মিসরে বসবাস করতে থাকলেন। ওখানেও তিনি আল্লাহ তাআলার পয়গামের দাওয়াত এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বারণ করার কর্মে ব্রতী হলেন। কথিত আছে যে তাঁর যুগে বাহাত্তরটি ভাষা প্রচলিত ছিলো। তিনি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সে-যুগের সব ভাষাতেই অভিজ্ঞ ছিলেন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের ভাষাতেই হেদায়েত, দাওয়াত ও তাবলিগ করতেন। হযরত ইদরিস আ. আল্লাহর দীনের প্রতি দাওয়াত ও তাবলিগ ছাড়াও দেশ শাসন, শহরের জীবনযাপন পদ্ধতি এবং সহজীবনযাপনের নিয়ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করে তাদেরকে দেশ শাসন ও তার মূলনীতি এবং শাখা বিধি-বিধান শেখালেন। এই শিক্ষার্থীরা পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা অর্জনের পর নিজ নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গেলো এবং শহর ও বসতিসমূহ আবাদ করলো। এসব শহর ও বসতিগুলোকে তারা শিক্ষালব্ধ নীতি ও নিয়ম অনুযায়ীই আবাদ করলো। তাদের আবাদকৃত শহরের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুইশো ছিলো। এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলো রাহা শহর।[৪৪] হযরত

---

[৪৩] বার্বলিউন শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ তোমাদের দিকের নদী; কেউ বলেছেন, পবিত্র ও বরকতময় নদী। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য মত হলো, یون শব্দটি সুরিয়ানি ভাষা বিশদ ও বিস্তারিত-এর অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং এর অর্থ বড় নদী।

[৪৪] এর অস্তিত্ব ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মুছে গেছে। কিন্তু তার ভগ্নাবশেষ আজো পরিলক্ষিত হয়।

ইদরিস আ. এই শিক্ষার্থীদেরকে অন্যান্য শাস্ত্রও শিখিয়েছিলেন। তার মধ্যে দর্শনশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত ইদরিস আ.-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম দর্শন শাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে নক্ষত্রমণ্ডলী এবং তাদের বিন্যাস, তারকারাজি এবং তাদের একত্র হওয়া ও দূরে সরে যাওয়ার গুরুত্ব এবং পারস্পরিক আকর্ষণের রহস্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁকে সংখ্যা ও গণিতশাস্ত্রেও অভিজ্ঞ বানিয়েছিলেন। যদি আল্লাহ তাআলার এই নবীর মাধ্যমে এসব শাস্ত্রের বিকাশ না ঘটতো মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির পক্ষে ঐ পর্যন্ত পৌছা দুষ্কর হয়ে যেতো। তিনি বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের জন্য তাদের অবস্থা অনুযায়ী আইন-কানুন ও রীতিনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ভূমণ্ডলকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন এবং প্রত্যেক চতুর্থাংশের জন্য একজন গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। গভর্নর সেই ভূখণ্ডের শাসন ও আধিপত্যের দায়িত্বশীল সাব্যস্ত হয়েছিলেন। আর ভূমণ্ডলের সেই চারটি অংশের জন্য এটা আবশ্যক করে দেয়া হয়েছিলো যে এসব আইন-কানুন ও রীতিনীতির চেয়ে আল্লাহর ওহির মাধ্যমে যেসব আইন-কানুন তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে সেগুলো অগ্রগণ্য থাকবে। ভূমণ্ডলের চারটি অংশের গভর্নর ও শাসকদের মধ্যে প্রথম চারজন শাসক বা বাদশাহর নাম নিচে উদ্ধৃত করা হলো।

১. ইলাওয়াস (অর্থাৎ দয়ালু); ২. যুস; ৩. ইসকালিবুস; ৪. যুস আমুন বা ইলাওয়াস আমুন অথবা বাসলিউস।

হযরত ইদরিস আ.-এর শিক্ষার সারমর্ম

হযরত ইদরিস আ.-এর শিক্ষার সারকথা বা সারমর্ম এই : আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা; একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর ইবাদত করা; পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সৎকাজকে ঢাল হিসেবে অবলম্বন করা; দুনিয়ার প্রতি বিকর্ষণ ও বিমুখতা; যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ন্যায় ও ইনসাফের মানদণ্ডকে সামনে রাখা; নির্ধারিত নিয়মে আল্লাহর ইবাদত করা; আইয়ামে বিযের[৪৫] রোযা রাখা;

[৪৫] চান্দ্র মাসের ১৪, ১৫ ও ১৬ তারিখ।

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং গাঁজাতীয় মাদক দ্রব্য থেকে দূরে থাকা। এগুলো ছিলো হযরত ইদরিস আ.-এর শিক্ষার সারনির্যাস। তিনি আল্লাহর নির্দেশে তাঁর অনুসারীদের জন্য কয়েকটি ঈদের দিন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আর কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর নামে উৎসর্গ ও কুরবানি করা ফরয করে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে কোনো কোনোটি নতুন চাঁদ দেখার পর সমাধা করা হতো। আবার কোনোটি সমাধা করা হতো সূর্য তার কক্ষপথে প্রবেশ করলে আর কোনোটি করা হতো পরিভ্রমণকারী সাত নক্ষত্র নিজ নিজ গ্রহে ও শারফ নামক কক্ষপথে প্রবেশ করলে এবং কোনোটি করা হতো কতিপয় ভ্রমণকারী নক্ষত্র অপর কতিপয় ভ্রমণকারী নক্ষত্রের সামনে এসে পড়লে।

আল্লাহর নামে উৎসর্গ করার নিয়ম

আল্লাহ তাআলার নামে কুরবানি করার জন্য হযরত ইদরিস আ.-এর কাছে তিনটি বস্তু গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। সুগন্ধী দ্রব্যের ধোঁয়া, জীবজন্তুর কুরবানি এবং শরাব।[৪৬] তা ছাড়া মেওয়া ফল, ফুল ইত্যাদির মধ্য থেকে মৌসুমের প্রথম বস্তুটি আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা একান্ত জরুরি মনে করা হতো। ফলের মধ্যে আপেল, শস্যবীজের মধ্যে গম এবং ফুলের মধ্যে গোলাপের অগ্রাধিকার ছিলো।

পরবর্তী নবীগণ সম্পর্কে সুসংবাদ

হযরত ইদরিস আ. তাঁর উম্মতদেরকে এটাও বলেছিলেন যে বিশ্বের মানবজাতির ধর্মীয় ও পার্থিব সংশোধনের জন্য আমার মতো অনেক নবী আগমন করবেন। তাঁদের প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্য হবে : ১. মন্দ কাজ থেকে পবিত্র থাকবেন; ২. অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণে পরিপূর্ণ গুণান্বিত হবেন; ৩. জমিন ও আকাশের অবস্থাবলি এবং বিশ্বের সকল সৃষ্টির জন্য হিত ও কল্যাণ রয়েছে যেসব বিষয়ে সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহর ওহির মাধ্যমে এমনভাবে জ্ঞাত থাকবেন যে কোনো প্রশ্নকারীই অতৃপ্ত থাকবে না।

---

[৪৬] কিন্তু বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের এ-ধরনের বিপরীতমুখী বিস্মিত হতে হয়। কেননা, একদিকে তাঁরা হযরত ইদরিস আ.-এর শরিয়তে শরাব হারাম বলে উল্লেখ করেছেন; এবং এদিকে তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য শরাব উৎসর্গ করার কথা বলছেন। এটা নিশ্চয় বিস্ময়কর বিষয়।

তাঁদের দোয়া কবুল হবে এবং তাঁদের দীন প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হবে বিশ্ববাসীর সংশোধন।

হযরত ইদরিস আ.-এর পার্থিক খেলাফত

যখন হযরত ইদরিস আ.কে আল্লাহর জমিনের খলিফা ও অধিপতি বানিয়ে দেয়া হলো তখন তিনি আল্লাহর বান্দাদেরকে ইলম ও আমলের পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি স্তরে বিভক্ত করে দিলেন। তিনটি স্তর হলো কাহিন বা জ্যোতিষী, রাজা ও প্রজা; তিনি ক্রমিক প্রর্যায়ে তাদের মধ্যে মর্যাদা নির্ধারণ করে দিলেন। কাহিন বা জ্যোতিষীর মর্যাদা সবার চেয়ে উঁচু। কারণ তাকে আল্লাহর দরবারে নিজেকে ছাড়া রাজা ও প্রজার ব্যাপারেও জবাবদিহি করতে হবে। দ্বিতীয় স্তরের মর্যাদায় আছেন রাজা। কারণ তাকে নিজের এবং রাজত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জবাবদিহি করতে হবে। তৃতীয় স্তরে প্রজা। কারণ তাকে শুধু নিজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। এই পর্যায়ক্রমিক মর্যাদাস্তর দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ছিলো; বংশ বা গোত্রের মর্যাদার তারতম্যের পরিপ্রেক্ষিতে ছিলো না। মোটকথা, হযরত ইদরিস আ.-কে আল্লাহ তাআলার কাছে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত তিনি শরিয়ত ও রাষ্ট্রনীতির এইসব আইন-কানুন প্রচার করতে থাকেন।

উপরিউক্ত চারজন গভর্নর বা বাদশাহর মধ্যে ইসকালিবুস অত্যন্ত দৃঢ়চেতা বাদশাহ ছিলেন। তিনি হযরত ইদরিস আ.-এর বাণীসমূহ গুরুত্বের সঙ্গে হেফাজত করেন এবং শরিয়তের বিধি-বিধান বেশ সংরক্ষণ করেন। ইসকালিবুস হযরত ইদরিস আ.-কে উঠিয়ে নেয়ার পর অত্যন্ত দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেন। উপাসনাগৃহগুলোতে ইদরিস আ.-এর এবং তাঁর উঠিয়ে নেয়ার অবস্থার নানা ধরনের ছবি অঙ্কিত করালেন।

হযরত নুহ আ.-এর প্লাবনের পর যে-ভূখণ্ডকে 'ইউনান' বা গ্রিস নামে অভিহিত করা হতো, ইসকালিবুস সেই ভূখণ্ডের ওপর রাজত্ব করতেন। ইউনানবাসীরা প্লাবনের ধ্বংসলীলা হতে রক্ষিত টুটা-ফাটা উপসনাগৃহগুলোতে যখন হযরত ইদরিস আ.-এর প্রতিমূর্তি এবং আল্লাহর দরবারে তাঁকে উঠিয়ে নেয়ার চিত্র দেখতে পেলো এবং সেই সঙ্গে বাদশাহ ইসকালিবুসের মহত্ত্ব, তাঁর ইবাদতখানা নির্মাণ, দর্শন ও

অন্যান্য শাস্ত্র সংকলনের খ্যাতি শুনলো, তারা ভুল বুঝলো যে ইসকালিবুসই সেই ব্যক্তি যাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। অথচ এটা স্পষ্ট ভুল। তারা কেবল ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে এই ভুল অবলম্বন করেছে।

হযরত ইদরিস আ.-এর আকৃতি ও গঠন

হযরত ইদরিস আ.-এর আকৃতি ও গঠন ছিলো এমন : গোধূম-বর্ণ, পূর্ণাবয়ব, মাথায় কম চুল, সুশ্রী ও সুদর্শন, ঘন দাড়ি, রঙরূপ ও চেহারার কমনীয়তা, কঠিন বাহু, প্রশস্ত কাঁধ, শক্ত হাড়, হালকা-পাতলা গঠন, চোখ দুটি উজ্জ্বল সুরমা রঙের, কথাবার্তায় গাম্ভীর্যতা, নীরবতাপ্রিয়, গম্ভীর ও দৃঢ়চেতা, চলাচলে নিম্নদৃষ্টি, চরম পর্যায়ের চিন্তা ও অনুসন্ধানে অভ্যস্ত, ক্রোধের সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, কথা বলার সময় তর্জনী দ্বারা বার বার ইঙ্গিত করতে অভ্যস্ত। হযরত ইদরিস আ. ৮২ বছর আয়ু পেয়েছিলেন। তাঁর আংটির ওপর এই বাক্যটি অঙ্কিত ছিলো—

الصبر مع الإمان بالله يورث الظفر

'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য বিজয়ের কারণ হয়ে থাকে।'

আর তাঁর কোমরবন্দের ওপর লিখিত ছিলো—

الأعياد فى حفظ الفروض و الشريعة من تمام الدين و تمام الدين كمال المروة

প্রকৃত ঈদ বা আনন্দ আল্লাহ তাআলার ফরজ কর্তব্যগুলো সংরক্ষণের মধ্যেই নিহিত; দীনের পূর্ণতা শরিয়তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং মানবতার পূর্ণতা অর্জনেই ধর্মের পূর্ণতা সাধিত হয়।'

আর জানাযার নামাযের সময় তিনি যে-পাগড়িটি বাঁধতেন তাতে নিচের বাক্যটি লেখা থাকতো—

السعيد من نظر لنفسه و شفاعته عند ربه أعماله الصالحة

'সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান যে নিজের নফসের প্রতি দৃষ্টি রাখে। আর রবের দরবারে মানুষের জন্য সুপারিশকারী হলো তার সৎকর্মসমূহ।'

হযরত ইদরিস আ.-এর অনেক উপদেশ ও নসিহত এবং তাঁর চালচলন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বাণীসমূহ প্রসিদ্ধ রয়েছে। তার মধ্যে থেকে কয়েকটি বাণী নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। আল্লাহ তাআলার সীমাহীন নেয়ামতের শোকর আদায় মানব-ক্ষমতার বাইরে।

২। যে ব্যক্তি জ্ঞানের পূর্ণতা ও সৎকাজের আকাঙ্ক্ষা করে, তার জন্য মূর্খতার কারণসমূহ এবং অসৎকাজের কাছেও যাওয়া উচিত নয়। তুমি কি দেখো না যে সব দর্জি সেলাই করতে চাইলে সুই হাতে নেয়, বর্ম হাতে নেয় না। সুতরাং, সবসময় এ-বাক্যটির প্রতি যেনো লক্ষ্য থাকে—'আল্লাহকেও পেতে চাইবে আবার দুনিয়ার মোহেও মত্ত থাকবে তা অসম্ভব কল্পনা এবং পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।

৩। দুনিয়ার ধন-দৌলতের পরিণাম আক্ষেপ এবং অসৎকাজের পরিণাম অনুতাপ।

৪। আল্লাহ তাআলা যিকির ও নেক আমলে খাঁটি নিয়ত থাকা শর্ত।

৫। মিথ্যা শপথ করো না। আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামকে কসমের জন্য অনুশীলনীয় শ্লেটরূপে ব্যবহার করো না। মিথ্যাবাদীদেরকে কসম খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করো না। কারণ, এ-ধরনের কাজ করলে তুমিও তাদের পাপের অংশীদার হয়ে যাবে।

৬। হীন পেশা অবলম্বন করো না। (যেমন, সিঙ্গা লাগানো, গৃহপালিত পশুকে পাল দেখিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা ইত্যাদি।)

৭। (শরিয়তের বিধান জারি করার জন্য পয়গম্বর কর্তৃক নিয়োজিত) বাদশাহকে মান্য করো। নিজের মুরুব্বী ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সামনে বিনয়ী থেকো। আর সবসময় আল্লাহ তাআলার স্তুতি দ্বারা নিজের জিহ্বাকে আর্দ্র রেখো।

৮। জ্ঞান-বিজ্ঞান আত্মার জীবন।

৯। অন্যের সচ্ছল জীবিকার প্রতি হিংসা পোষণ করো না। কারণ তাই এই আনন্দময় জীবনযাপন ক্ষণস্থায়ী।

১০। যে-ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে বেশি প্রত্যাশা করে সে কখনোই তৃপ্ত হতে পারে না।

তারিখুল হুকামার ৩৪৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় হারমাসের আলোচনায় এটাও বর্ণিত হয়েছে যে এক দল আলেম এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে হযরত

নুহ আ.-এর পাবনের পূর্বে পৃথিবীতে যে-পরিমাণ বিদ্যা প্রসার লাভ করেছে, তার সবকিছুরই আদি শিক্ষক এই প্রথম হারমাস। তিনি মিসরের উচ্চভূমির অধিবাসী ছিলেন এবং হিব্রুভাষীরা তাঁকে খানুখ নবী বলে মানতো। তিনি হযরত আদম আ.-এর প্রপৌত্র ছিলেন। অর্থাৎ, খানুক (ইদরিস) বিন ইয়ারুদ বিন মাহলাইল বিন কীনান বিন আনুশ বিন শীস বিন আদম আ.।

তাঁরা এটাও দাবি করেন যে, দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে যেসব জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং নক্ষত্রসমূহের গতিবিধির বিবরণ পাওয়া যায় তা সর্বপ্রথম হযরত ইদরিস আ.-এর পবিত্র জবান থেকে নিসৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য ইবাদতখানা নির্মাণ, চিকিৎসা শাস্ত্রের আবিষ্কার, জমিন ও আসমানের যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে যথাপোযুক্ত কবিতার মাধ্যমে মতামত প্রকাশই তাঁর প্রাথমিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। তিনি সর্বপ্রথম প্লাবনের সংবাদ প্রদান করেন এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। তিনি বলেছিলেন, আমাকে দেখানো হয়েছে যে তা একটি আসমানি মহামারী। তা পৃথিবীকে পানি ও আগুনের মধ্যে জড়িয়ে ধরছে। এই দৃশ্য দেখে ইদরিস আ. যাবতীয় জ্ঞানের ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং শিল্প ও পেশার ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি মিসরে পিরামিড এবং চারদিক থেকে বদ্ধ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে সেগুলোতে যাবতীয় শিল্প এবং সে-সম্পর্কিত নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিসমূহের ছবি বানালেন। তিনি সকল জ্ঞান ও শাস্ত্রের তথ্যাবলি ও বিবরণ অঙ্কিত করালেন। যাতে এসব শিল্প ও বিদ্যা চিরকালের জন্য স্থায়ী থাকে এবং ধ্বংসের থাবা তাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

সিদ্ধান্ত

দার্শনিকদের এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রাচীন গ্রন্থগুলোর এসব আজগুবি ও অনর্থ (অবশ্য কোনো কোনোটি ছাড়া) বক্তব্যগুলোর সারমর্ম এই যা হযরত ইদরিস আ.-এর সম্পর্কে মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনির আকারে রচনা করা হয়েছে। এগুলো বিবেকবুদ্ধিসম্মত নয় এবং এগুলোর সমর্থনে কোনো উদ্ধৃতিও নেই। বরং তথ্যানুসন্ধান এবং ইতিহাসের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান এসব মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনির অসারতা ও ভিত্তিহীনতাকে আজ এমনভাবে প্রকাশ করে দিচ্ছে যে (নতুন তথ্য ও বিশুদ্ধ ইতিহাসকে)

অস্বীকার করা বাস্তব ও সত্যকে অস্বীকার করারই নামান্তর। যেমন, পিরামিড ও চারদিক থেকে বন্ধ প্রকোষ্ঠ-এর ইতিহাস নতুন আবিষ্কারের কল্যাণে আজ আমাদের সামনে সম্পূর্ণ উন্মোচিত এবং নতুন নতুন আবিষ্কার পিরামিড ও তার সমাধিসমূহের খোদাইলিপি ও খোদাইচিত্র, (ইলম ও নকশা) শিল্প ও কারিগরি বিদ্যার চিত্র অঙ্কনকারীদের নাম এবং বিভিন্ন যুগে সেগুলোকে বিভিন্ন স্তরে উন্নীতকারীদের নাম, তাদের দেহাবয়ব, তাদের মণি-মুক্তার ভাণ্ডার, বিভিন্ন যুগের হস্তলিপি এবং বর্ণমালার সংযোজন চোখের সামনে নিয়ে এসে দিবালোকের মতো উজ্জ্বল করে তুলেছে। কোথায় এই প্রকৃত তথ্য ও বাস্তবতা আর কোথায় সেই ভিত্তিহীন মনগড়া রচনা। আজকাল মিনা, খোফো, মুনকারে এবং তোতামান খামেন এবং অন্যান্য বাদশাহর অবস্থাবলি সম্পর্কে কার অজানা আছে?

তারপরও এসব অর্থহীন বক্তব্যগুলোকে এখানে উদ্ধৃত করা এজন্য সঙ্গত মনে হলো যে মানুষ জেনে রাখুক নবীদের সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের গ্রন্থাবলিতেও কেমন উদ্ভট ও অর্থহীন কিচ্ছা-কাহিনি লেখা হয়েছে।

এ-সম্পর্কে নির্ভুল সত্যের পরিমাণ কেবল ততটুকুই যা আমি কুরআন মাজিদ ও সহিহ হাদিস থেকে উদ্ধৃত করেছি, বা নিজের কোনো মতামত ব্যক্ত না করে তাওরাত থেকে যে-কয়েকটি বাক্য বর্ণনা করা হয়েছে অথবা সেই বক্তব্যগুলো যা নবীগণের শিক্ষার মর্যাদার উপযোগী।

হযরত হূদ আলাইহিস সালাম

কুরআন মাজিদে হযরত হুদ আ.-এর উল্লেখ

কুরআন মাজিদের সাত জায়গায় হযরত হুদ আ.-এর উল্লেখ করা হয়েছে। নিচের ছক থেকে তা প্রকাশ পাচ্ছে :

সুরা	সুরার নাম	আয়াত
৬	সুরা আন'আম	৬৫
১১	সুরা হুদ	৫০, ৫৩, ৫৮, ৬০, ৮৯
২৬	সুরা শুআরা	১২৪

কুআনুল কারিমে কওমে আদের উল্লেখ

কুরআন মাজিদের সুরা আ'রাফ, সুরা হুদ, সুরা মুমিনুন, সুরা শুআরা, সুরা হা-মীম আস-সাজদা, সুরা আহকাফ, সুরা আযযারিয়াত, সুরা আল-কামার, সুরা আল-হাককাহ—এই নয়টি সুরায় কওমে আদের আলোচনা করা হয়েছে।

কওমে আদ

কওমে আদ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার করার পূর্বে এই কথাগুলো বলে দেয়া দরকারি মনে হচ্ছে যে কুরআন মাজিদ ব্যতীত কোনো ইতিহাসগ্রন্থ বা তাওরাত কিতাব কওমে আদ সম্পর্কে আলোকপাত করে নি। সুতরাং এই কওমের অবস্থাবলির চিত্র কেবল কুরআন মাজিদের মাধ্যমেই অঙ্কিত হতে পারে। অথবা ইলমে হাদিসের তত্ত্বজ্ঞানীরা এ-সম্পর্কে যেসব বক্তব্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলোর মাধ্যমে চিত্রিত হতে পারে। কুরআন মাজিদ যেহেতু নিশ্চিত সত্য, সুতরাং তার বর্ণিত তথ্যও সন্দেহাতীতভাবে সত্য। এছাড়া অন্যদের বক্তব্য অনুমান ও ধারণপ্রসূত, সুতরাং তাদের বর্ণিত ঘটনাবলিও ধারণা ও অনুমানের বেশি কিছু নয়।
কওমে আদ আরব দেশের একটি প্রাচীন গোত্র অথবা সামি জাতিগোষ্ঠীর একটি শক্তিশালী ও পরক্রমশালী দলের নাম। প্রাচীন ইতিহাসের কোনো কোনো ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ একটি Mythology বা কাল্পনিক কাহিনি বলে বিশ্বাস রাখেন। কিন্তু তাঁদের এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল ও অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। কেননা, নতুন গবেষণাসমূহের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো আরবের আদিম অধিবাসীরা সংখ্যাধিক্যের কারণে এব বহুসাত্তিক জাতিগোষ্ঠীর হিসেবে একটি বিশাল ও ব্যাপক দলরূপে

বিদ্যমান ছিলো। তারা আরব দেশ থেকে বের হয়ে সিরিয়া, মিসর ও বাবেলের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে শক্তিশালী রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিলো। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আরবেরা সেসব অধিবাসীদেরকে 'উমামে বায়িদা' (ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহ) বা 'আরবে আরিবা' (খাঁটি আরব) বলে জানতো এবং তাদেরকে বিভিন্ন দল—বা গোত্র আদ, সামুদ, তাসাম ও জাদিস নামে আখ্যায়িত করতো। আর ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদগণ (প্রাচ্যের ভাষা ও তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ) উপরিউক্ত খাঁটি আরবদেরকে 'উমামে সামিয়া' (সাম জাতিগোষ্ঠী) বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। তাই পরিভাষা ও অভিব্যক্তির পার্থক্যের কারণে মূল বস্তু ও ঘটনাবলিতে কোনো পরিবর্তন আসে না। এ-কারণে কুরআন মাজিদ তাদেরকে বলেছে 'প্রথম আদ', যাতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে আরবের প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী সাম সম্প্রদায় ও আদ সম্প্রদায় একই মৌলিক জিনিসের দুটি নাম।

ভূগোলবিশারদগণ বলেন, عرب (আরব) শব্দটি মূলে عربه (আরাবাহ) ছিলো—এর অর্থ প্রান্তর ও অনাবাদ ভূমি। আরবি ভাষায়ও اعراب (আরাব) অনাবাদ প্রান্তর ও গ্রাম্য লোকদেরকে বলা হয়। কোনো কোনো তত্ত্বগবেষকের মতে عرب (আরব) শব্দটি মূলে غرب (আইন-এর ওপর নুকতাসহ, গার্‌ব) ছিলো। এর অর্থ পশ্চিম দিক। যেহেতু ফোরাত নদীর পশ্চিম দিকে এই এলাকাটির অবস্থান ছিলো, এ-কারণে সেসব আরামি সম্প্রদায় (সাম জাতিগোষ্ঠী—নুহ আ.-এর পুত্র সামের বংশধরগণের বিভিন্ন গোত্র) যারা ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে বসবাস করতো, তাদের প্রথমে غرب (গার্‌ব) এবং পরে গাইন থেকে নুকতা লোপ করে عرب (আরব) বলা হলো।

এই দুটি মতের মধ্যে আরব নামকরণের ক্ষেত্রে যে-মতটিই বিশুদ্ধ হোক, বাস্তবতা হলো যে এই এলাকাটি প্রাচীন সাম সম্প্রদায়সমূহ বা যাযাবর দলসমূহ অথবা আদ সম্প্রদায়ের বসবাসস্থল ছিলো। সুতরাং, কোনো মতভেদ ছাড়াই আদ সম্প্রদায় আরব বংশোদ্ভূত ছিলো।

عاد (আদ) শব্দটি আরবি, অনারব নয়। হিব্রু ভাষায় এর অর্থ 'উচ্চ' ও 'প্রসিদ্ধ'। কুরআন মাজিদে عاد (আদ) শব্দটির সঙ্গে ارم (ইরাম) শব্দটি

সংলগ্ন। إرم (ইরাম) ও سام (সাম) শব্দের অর্থও 'উচ্চ' এবং 'প্রসিদ্ধ'ই। এই عاد (আদ)-কেই তাওরাতের ভুল অনুসরণে কোনো কোনো স্থানে عمالقة (আমালিকাহ)-ও বলা হয়েছে।

আদ সম্প্রদায়ের যুগ

অনুমান করা হয়, আদ সম্প্রদায়ের যুগ ছিলো হযরত ঈসা আ.-এর প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে। আর কুরআন মাজিদে আদ সম্প্রদায়কে من بعد قوم نوح (নুহের সম্প্রদায়ের পরবর্তী) সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করে হযরত নুহ আ.-এর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ-কথা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সিরিয়া অঞ্চলের দ্বিতীয়বার আবাদ হওয়ার পর আদ সম্প্রদায় থেকেই উমামে সামিয়া অর্থাৎ সাম বংশধরদের উন্নতি শুরু হয়।

আদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান

আদ সম্প্রদায়ের বসবাসের কেন্দ্রস্থল ছিলো 'আহকাফ' অঞ্চল। এটা 'হাযরামাউতে'র উত্তরে অবস্থিত ছিলো। এর ভৌগলিক অবস্থান এমন : এর পূর্বে ওমান, দক্ষিণে 'হাযরামাউত' এবং উত্তরে 'রুবউলখালি'। কিন্তু বর্তমানে এখানে বালুর স্তূপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আর কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন, তাদের বসবাস-এলাকা আরবের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ হাযরামাউত ও ইয়ামানে পারস্য উপসাগরের তীরে ইরাকের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। ইয়ামান ছিলো তাদের রাজধানী।

আদ সম্প্রদায়ের ধর্ম

আদ সম্প্রদায় মূর্তিপূজক ছিলো। তাদের পূর্ববর্তী নুহ আ.-এর সম্প্রদায়ের মতো মূর্তিপূর্জা ও মূর্তিনির্মাণের কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলো। কোনো কোনো প্রাচীন ইতিহাসবিশেষজ্ঞ বলেন, তাদের বাতিল উপাস্যগুলো হযরত নুহ আ.-এর সম্প্রদায়ের বাতির উপাস্যগুলোর মতো ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুছ ও নাসরই ছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে যে

তাদের একটি মূর্তির নাম ছামুদ এবং অন্য একটি মূর্তির নাম ছিলো হাতার। (ছাদা নামেও তাদের একটি বিখ্যাত মূর্তি ছিলো।)

হযরত হুদ আলাইহিস সালাম

আদ সম্প্রদায় তাদের রাজত্বের প্রতাপ ও দাপট, দৈহিক শক্তিমত্তা ও ক্ষমতার অহংকারে এতটাই মত্ত হয়ে পড়েছিলো যে তারা একমাত্র মাবুদ আল্লাহ তাআলাকে একেবারেই ভুলে বসেছিলো এবং নিজেদের হাতে-গড়া মূর্তিসমূহকে তাদের উপাস্য সাব্যস্ত করে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত মনে সব ধরনের শয়তানি কর্মকাণ্ড করছিলো। তখন আল্লাহ তাআলার তাদের মধ্য থেকে হুদ নামক একজন নবীকে তাদের হেদায়েত ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য পাঠালেন। হযরত হুদ আ. আদ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে সম্মানিত শাখা 'খুলুদ'-এর সদস্য ছিলেন। সাদা ও লালাভ বর্ণের এবং গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন এবং তাঁর দাড়ি ছিলো অত্যন্ত লম্বা।[৪৭]

ইসলামের দাওয়াত

হযরত হুদ আ. তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলার একত্ব ও তাঁর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানালেন। মানুষের প্রতি জুলুম করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু আদ জাতি তাঁর কথায় মোটেই কান দিলো না। তাঁকে কঠোরভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো এবং ঔদ্ধত্য ও গর্বের সঙ্গে বললো— مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً 'আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে?'[৪৮] আজ গোটা পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে অধিক প্রতাপ ও ক্ষমতার অধিকারী আর কে আছে? কিন্তুহযরত হুদ আ. অবিরাম ইসলামের দাওয়াত দিয়েই যেতে থাকলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করতে এবং অহংকার ও অবাধ্যতার পরিণাম বর্ণনা করে হযরত নুহ আ.-এর ঘটনাগুলো মনে করিয়ে দিতেন। আর কোনো কোনো সময় বলতেন—

"হে আমার কওম, নিজেদের দৈহিক শক্তিমত্ত ও রাজকীয় ক্ষমতা ও দাপটের জন্য অহংকার করো না। বরং আল্লাহ তাআলার শোকর আদায়

---

[৪৭] কিতাবুল আম্বিয়া, ৭ম খণ্ড।

[৪৮] সুরা ফুসসিলাম : আয়াত ১৫।

করো যিনি তোমাদেরকে এই নিয়ামত দান করেছেন। তিনি নুহ আ.-এর সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর তোমাদেরকে জমিনের মালিক ও অধিপতি বানিয়েছেন। উত্তম জীবিকা, নিশ্চিন্তা ও প্রফুল্লতা এবং সচ্ছলতা দান করেছেন। সুতরাং, তাঁর অনুগ্রহসমূহ ভুলে যেয়ো না এবং নিজেদের হাতে-গড়া প্রতিমাগুলোর উপাসনা করা থেকে বিরত থাকো। প্রতিমাগুলো তোমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না এবং তোমাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। জীবন ও মৃত্যু এবং উপকার ও অপকার একমাত্র আল্লাহ তাআলারই হাতে।

হে আমার কওম, মানলাম তোমরা দীর্ঘকালব্যাপী আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যাচরণে লিপ্ত রয়েছো ; কিন্তু আজো যদি তওবা করে নাও এবং ওইসব অবাধ্যাচরণ ও নাফরমানি থেকে বিরত হও, তাহলে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ খুবই বিস্তৃত ও ব্যাপক এবং তওবার দরজা এখনো বন্ধ হয় নি। তোমরা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। তোমরা তাঁর প্রতি অনুগত হয়ে যাও, তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। তাকওয়া ও পবিত্রতার জীবন অবলম্বন করো, তিনি তোমাদেরকে বহুগুণে উন্নতি দান করবেন। বেশির থেকে বেশি মর্যাদা দান করবেন। ধনে ও মানে তোমাদেরকে খুব সমৃদ্ধ করে দেবেন।"

হযরত হুদ আ. দীনের দাওয়াত ও সত্যের পয়গাম পৌছানোর পাশাপাশি বারবার এটাও বলছিলেন যে এ-জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো ধরনের প্রতিদান বা বিনিময় চাই না। তার ইচ্ছাও আমার নেই। আমার প্রতিদান ও পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহর হাতে। সম্পদের চাহিদা এবং ধন-সম্পদের লোভ থেকে নবীর জীবন পবিত্র। কেউ-ই এই অপবাদ দিতে পারবে না যে নবী সম্পদ অর্জনের জন্য এটা করছেন, ওটা করছেন বা তিনি ক্ষমতা ও দাপট অর্জনের জন্য এটা-সেটা করছেন অথবা সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি তা করছেন। ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদা কোনোটাই তার সামনে নেই। তাঁর সামনে কেবল একটাই উদ্দেশ্য—তা হলো আল্লাহপাকের আবশ্যক কর্তব্যগুলো পালন করা এবং প্রকৃত মালিকের বিধি-বিধানগুলো পৌছে দেয়া।

আদ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈমানদার লোক তো ছিলো সামান্য কয়েকজন, অবশিষ্ট সব ছিলো উদ্ধত ও অবাধ্য লোকের দল। তাদের কাছে হযরত

হুদ আ.-এর এই উপদেশ ও নসিহত নিতান্তই অস্বস্তিকর ও পীড়াদায়ক মনে হতো। তারা এটা বরদাশত করতে পারতো না যে তাদের চিন্তা-চেতনায়, বিশ্বাস ও আকিদায়, তাদের কর্মকাণ্ডে—মোটকথা যে-কোনো ধরনের অভিপ্রায়ে কেউ প্রতিবন্ধক হয়, তাদের জন্য দয়ালু উপদেষ্টা সাজে। তখন তারা এই পথ অবলম্বন করলো যে তারা হযরত হুদ আ.-কে বিদ্রূপ করতে শুরু করলো, তাঁকে নির্বোধ সাব্যস্ত করলো এবং নিরঙ্কুশ সত্যতা ও সততার অকাট্য ও নিশ্চিত দলিল-প্রমাণগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করলো এবং হযরত হুদ আ.-কে বলতে লাগলো—

قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (سورة هود)

'হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আনো নি, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করার নই এবং আমরা তোমার প্রতিই বিশ্বাসী নই।' [সুরা হুদ : আয়াত ৫৩]

আমরা তোমার এই প্রবঞ্চনায় পতিত হবো না যে তোমাকে আল্লাহর রাসুল বলে মেনে নেবো এবং আমাদের উপাস্যসমূহের (প্রতিমাগুলো) পূজা ছেড়ে দিয়ে এ-কথা বিশ্বাস করবো না যে আমাদের এই উপাস্যগণ শ্রেষ্ঠ উপাস্যের (খোদার) কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না।

হযরত হুদ আ. তাদেরকে বললেন, আমি নির্বোধও নয় এবং উন্মাদও নই। নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসুল ও নবী। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য নির্বোধ ব্যক্তিদের নির্বাচিত করেন না। তাহলে তো এর লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে এবং হেদায়েতের জায়গায় পথভ্রষ্টতা এসে যাবে। আল্লাহ এই মহান খেদমতের জন্য তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন যিনি সবদিক থেকে উক্ত কাজের জন্য যোগ্য হন এবং হেদায়েতের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করতে পারেন।

اللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

'আল্লাহ তাঁর রিসালাতের ভার (রাসুলের পদ ও দায়িত্ব) কার ওপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন।' (অর্থাৎ কাকে নবী নিযুক্ত করলে মানবজাতির হেদায়েত সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।) [সুরা আনআম : আয়াত ১২৪]

কিন্তু তাঁর কওমের অবাধ্যতা ও বিরোধিতা উত্তরোত্তর বেড়েই চললো; সূর্যের চেয়ে অধিক দীপ্তিমান প্রমাণ এবং উপদেশসমূহ তাদের ওপর বিন্দুমাত্র ক্রিয়া করলো না। তারা হযরত হূদ আ.-কে মিথ্যা-প্রতিপাদনে ও হীন-প্রতিপন্নকরণে উঠেপড়ে লাগলো এবং তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ) পাগল ও বিকৃতমস্তিষ্ক বলে আরো বেশি বিদ্রূপ করতে শুরু করলো। তারা বলতে লাগলো, হে হূদ, যখন থেকে আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করতে শুরু করেছো এবং আমাদেরকে তাদের উপসনা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছো, আমরা লক্ষ করছি, তখন থেকেই তোমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের উপাস্যদের অভিশাপের ফলে তুমি উন্মাদ ও বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে গেলো। এখন আমরা তোমাকে এ ছাড়া আর কী মনে করবো? —এই ধৃষ্টতামূলক দুঃসাহস দেখিয়ে এবং অপবাদ প্রদান করে তারা ধারণা করছিলো যে এখন আর কেউ হযরত হূদ আ.-এর প্রতি মনোনিবেশ করবে না এবং মন দিয়ে তাঁর কথা শুনবে না।

হযরত হূদ আ. এসব কথা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শুনলেন। তারপর তাদেরকে বললেন, আমি আল্লাহ তাআলাকে এবং তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে সর্বপ্রথম এই ঘোষণা করছি—আমি এই বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র যে বাতিল মূর্তিগুলোর মধ্যে আমার বা অন্য কারোর কোনোভাবে কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে। এরপর তোমাদেরকে ও তোমাদের দেবতাদেরকেও চ্যালেঞ্জ করছি যে তাদের সাধ্য থাকলে আমার কোনো ক্ষতি করার জন্য অতি সত্বর অগ্রসর হোক। আমি আমার প্রতিপালকের দয়া ও অনুগ্রহে জ্ঞান-বুদ্ধি রাখি এবং প্রজ্ঞা ও বোধশক্তির অধিকারী। আমি তো শুধু আমার সেই প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করছি এবং তারই ওপর ভরসা রাখছি, যার ক্ষমতার বলয়ে রয়েছে বিশ্বজগতের যাবতীয় প্রাণীর ললাটসমূহ, যিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন এবং সব ধরনের ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষা করবেন।

অবশেষে হযরত হূদ আ. তাঁর সম্প্রদায়ের লাগাতার বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার বিরুদ্ধে এই ঘোষণা করলেন—যদি আদ সম্প্রদায়ের নীতি এমনই থাকে এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার রীতিতে তারা কোনো পরিবর্তন না আনে এবং আমার নসিহত ও

উপদেশসমূহ মনোযোগসহ না শোনে, তাহলে—যদিও আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সবসময় তৎপর ও সাহসী থেকেছি—তাদের ধ্বংস অবধারিত। আল্লাহ তাআলা অচিরেই তাদের বিনাশ ঘটাবেন এবং অন্য একটি সম্প্রদায়কে পৃথিবীর অধিপতি বানিয়ে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন। আর এটা সন্দেহাতীত যে তোমরা আল্লাহর অণু পরিমাণ ক্ষতিও করতে পারবে না। তিনি প্রতিটি বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান ও কর্তৃত্বকারী এবং প্রতিটি বস্তুর সংরক্ষক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। আর গোটা বিশ্বজগৎ তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার আয়ত্তাধীন।

হে আমার সম্প্রদায়, এখনো সময় আছে, তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান খাটিয়ে কাজ করো। হযরত নুহ আ.-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং আল্লাহর পয়গামের সামনে মাথা নত করো। অন্যথায় নির্দেশ ও বিচারের হাত প্রসারিত হয়ে আছে। আর সেই সময় অত্যাসন্ন, যখন তোমাদের এসব অহংকার ও গৌরব মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। তখন তোমরা অনুতপ্ত হলেও তাতে কোনো কল্যাণ হবে না।

হযরত হুদ আ. বার বার তাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করলেন—আমি তোমাদের শত্রু নই, বন্ধু। তোমাদের কাছে সোনা-রুপা এবং ক্ষমতা ও নেতৃত্ব প্রত্যাশা করি না; বরং আমি তোমাদের কল্যাণ ও সফলতা কামনা করি। আমি আল্লাহর পয়গামের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতক নই; বরং আমি বিশ্বস্ত। আমি কেবল তা-ই বলি যা আমাকে বলা হয়। আমি যা-কিছু বলি, কওমের সৌভাগ্য এবং তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কল্যাণের জন্যই বলি; বরং আমি তাদের চিরস্থায়ী মুক্তির জন্যই আমি তা বলছি।

তোমাদের কওমেরই একজন মানুষের প্রতি আল্লাহর বাণী নাযিল হওয়াতে তোমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, আবহমান কাল থেকেই এটা আল্লাহ তাআলার নীতি যে তিনি মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন ও তাদের সৌভাগ্যের জন্য তাদের মধ্য থেকেই একজনকে নির্বাচিত করেন। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে নিজের পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ ব্যক্ত করেন এবং তাঁর মাধ্যমে নিজের বান্দাদেরকে এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত করেন। প্রকৃতির চাহিদাও এটাই যে কোনো সম্প্রদায়ের সৎপথ প্রদর্শন এবং তাদের হেদায়েতের জন্য যেনো এমন

ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করা হয়, যিনি কথাবার্তায় তাদেরই মতো হন। তিনি তাদের আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে অবগত থাকেন। তিনি তাদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন এবং তাদের সঙ্গেই জীবনযাপন করতে থাকেন। এমন ব্যক্তির সঙ্গেই সম্প্রদায়ের মানুষদের মনের মিল হতে পারে। এমন ব্যক্তিই তাদের জন্য সত্যিকারের পথপ্রদর্শক ও স্নেহপরায়ণ হতে পারেন।

আদ সম্প্রদায় এসব কথা শুনে বিস্ময় ও অস্থিরতায় পতিত হলো। তারা বুঝতেই পারলো এক আল্লাহর ইবাদতের অর্থ কী। তারা চিন্তিত ও ক্রোধান্বিত হলো এই ভেবে—কীভাবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রথা প্রতিমাপূজা ত্যাগ করবো? এটা তো আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের চরম অপমান। তারা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো যে কেনো তাদেরকে কাফের ও মুশরিক বলা হয়। তারা তো কেবল তাদের প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী বলে বিশ্বাস করে। তারা ধারণা করে, হযরত হুদ আ.-এর কথা মেনে নেয়ায় আমাদের উপাস্যসমূহ এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নেই; উপাস্যগুলোকে তো আমরা বড় খোদার সামনে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস করি। আর এ-জন্যই আমরা ওইসব চিত্র ও প্রতিমার পূজা করি যাতে তারা এই পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের জন্য সুপাশির করে এবং ঐশ্বরিক শাস্তি থেকে আমাদের মুক্তি দেয়।

অবশেষে তারা আগুনের শিখার মতো জ্বলে উঠলো এবং হযরত হুদ আ.-এর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলো, তুমি আমাদেরকে আল্লাহর শাস্তির হুমকি দিচ্ছো এবং আমাদেরকে তার ভীতি প্রদর্শন করছো এই বলে—

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (سورة الشعراء)

'আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি মহাদিবসের শাস্তির।' (ভীষণ দিনের শাস্তি আগমনের আশঙ্কা করছি, পাছে তোমরা তার উপযুক্ত না হয়ে যাও।) [সুরা শুআরা : আয়াত ১৩৫]

সুতরাং হে হুদ, এখন আমরা তোমার ওই নিত্যদিনের উপদেশ-নসিহত শুনতে পারি না। এখন আমরা এমন স্নেহপরায়ণ উপদেষ্টার উপদেশ থেকে বিরত থাকলাম। যদি তুমি প্রকৃতপক্ষেই তোমার বক্তব্যে সত্যবাদী

হয়ে থাকো, তাহলে তোমার প্রতিশ্রুত শাস্তি সত্বর নিয়ে আসো। যাতে তোমার ও আমাদের এই কাহিনির অবসান ঘটে—

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (سورة الأعراف)

'সুতরাং তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে আসো।' (যে-শাস্তির কথা তুমি বলছো তা নিয়ে আসো।) [সূরা আ'রাফ : আয়াত ৭০]

হযরত হুদ আ. তাদের জবাবে বললেন, যদি আমার ন্যায়নিষ্ঠ ও সততাপূর্ণ উপদেশ ও নসিহতের জবাব এটাই হয়, তবে 'বিসমিল্লাহ'। আর শাস্তির জন্য যদি তোমাদের শখ ও আগ্রহ এতই হয়, তাহলে তা বেশি দূরে নয়—

قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ (سورة الأعراف)

'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে।' (তা এসেই পড়লো বলে।) [সূরা আ'রাফ : আয়াত ৭১]

তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে তোমার নিজেদের হাতে নির্মিত কতগুলো প্রতিমাকে মনগড়া নামে ডাকছো এবং তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ আল্লাহর দেয়া কোনো প্রমাণ ব্যতীতই মনগড়া নিয়মে তাদেরকে তোমাদের সুপারিশকারী বলে বিশ্বাস করছো? আর আমার উজ্জ্বল ও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ও অবাধ্যাচরণ করে শাস্তির দাবি করছো? যদি তোমাদের এতই শখ ও আগ্রহ হয়, তাহলে এখন তোমরাও অপেক্ষা করো আর আমিও অপেক্ষা করছি। সময় খুব সন্নিকট। এই বিষয়ে কুরআন মাজিদে এসেছে—

أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (سورة الأعراف)

'(হযরত হুদ আ. বললেন,) তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতগুলো (মনগড়া) নাম সম্পর্কে (অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিমা-উপাস্যগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছো?) যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্টি করেছো (নিজেদের হাতে গড়ে নিয়েছো) এবং যে-সম্পর্কে (যাদের পূজনীয় হওয়ার পক্ষে) আল্লাহ কোনো সনদ

পাঠান নি? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ৭১]

সারকথা, কওমে হুদ (আদ সম্প্রদায়)-এর সীমাহীন ইতরামি ও বিদ্রোহ এবং তাদের নবীর শিক্ষার প্রতি বাড়াবাড়ি রকমের শত্রুতা ও বিরোধিতা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছলো, তখন এসব অপকর্মের প্রতিফল-নীতি ও কর্মফলের কানুন কার্যকরী করার সময় এসে গেলো এবং আল্লাহ তাআলার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগলো। আল্লাহ তাআলার শাস্তি সর্বপ্রথম দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করলো। আদ সম্প্রদায় ভীষণ ঘাবড়ে গেলো। অস্থির হয়ে পড়লো। তারা খুবই অপারগ ও দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়লো। তখন নিজের জাতির প্রতি সমবেদনার আবেগ হযরত হুদ আ.-কে আবারো উৎসাহিত করলো। তিনি নিরাশ হওয়ার পরও আরো একবার তাঁর জাতিকে বুঝালেন যে সত্যের পথ অবলম্বন করো, আল্লাহর পথে ফিরে এসো, আমার উপদেশ ও নসিহতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আর এটাই তোমাদের মুক্তির একমাত্র পথ—দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। অন্যথায় তোমাদের পরিতাপ করতে হবে। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগা জাতির ওপর এই উপদেশের কোনো ক্রিয়াই হলো না; বরং তাদের ক্রোধ ও বিরোধ আরো বহুগুণে বেড়ে গেলো। তখন ভয়ঙ্কর আযাব এসে তাদের ঘিরে ফেললো। একনাগাড়ে আটদিন ও সাতরাত প্রচণ্ড বেগে ঝঞ্ঝা বয়ে গেলো। আদ সম্প্রদায়কে এবং তাদের গোটা বসতিকে ওলটপালট করে দিলো। শক্তিশালী ও সুঠাম আকৃতির মানুষগুলো—যারা নিজেদের দৈহিক শক্তিমত্তার গর্বে চরম অবাধ্যাচরণে মত্ত ছিলো—এমন অসাড় ও অনভূতিহীন অবস্থায় দৃষ্ট হলো, যেমন প্রচণ্ড ঝড়ে স্থূলকায় গাছগুলো নিষ্প্রাণ হয়ে আছড়ে পড়ে থাকে। মোটকথা, তাদেরকে অস্তিত্বের জগৎ থেকে মুছে ফেলা হলো। যেনো তারা ভবিষ্যতের বংশধরগণের জন্য শিক্ষামূলক উদাহরণ হয়ে থাকে। দুনিয়া ও আখেরাতের অভিশাপ ও শাস্তি তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো। তারা এই শাস্তিরই উপযুক্ত ছিলো।[৪৯]

---

[৪৯] মুফাস্সিরগণ আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা তিন থেকে চার হাজার উল্লেখ করেছেন। রুহুল মাআনি ও অন্যান্য তাফসিরে এ-সংখ্যাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজিদে তাদের ক্ষমতা ও দাপট এবং জাঁকজমকপূর্ণ রাজত্বের কথা বর্ণনা

হযরত হুদ আ. এবং তাঁর অনুসারী একনিষ্ঠ মুসলমানগণ আল্লাহ তালার রহমত ও অনুগ্রহে থাকার ফলে খোদায়ি আযাব থেকে সুরক্ষিত থাকলেন। তাঁরা অবাধ্য সম্প্রদায়ের অবাধ্যচরণ ও বিদ্রোহ থেকে নিরপদ হয়ে গেলেন।

এটা হলো প্রথম আদ সম্প্রদায়ের উপদেশমূলক কাহিনি। এতে উপদেশ-দর্শনকারী চক্ষুর জন্য অসংখ্য উপদেশ ও নসিহত রয়েছে। এই কাহিনি আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং তাকওয়া পবিত্রতার জীবনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। ইতরামি, বিরুদ্ধাচরণ, আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতার শোচনীয় পরিণাশ সম্পর্কে অবহিত করছে আর সাময়িক সচ্ছল জীবিকার কারণে গর্বিত ও উদ্ধত হয়ে ভয়াবহ পরিণামকে বিদ্রূপ করা থেকে ভীতি প্রদর্শন করছে এবং বিরত রাখছে।

মোটকথা, কুরআন মাজিদ হযরত হুদ আ.-এর এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ যে-শিক্ষামূলক পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে তা পাঠ করুন এবং উপদেশ, শিক্ষা ও মহামূল্যবান নসিহতের পাথেয় সঞ্চয় করুন। দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য ও সফলতার জন্য এগুলোই সর্বোৎকৃষ্ট সম্বল—

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ () قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ () قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ () أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ () أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ () قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ () قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ () فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (سورة الأعراف)

করা হয়েছে। আর সামের বংশধরগণের প্রাচীনকালীন অবস্থা সম্পর্কে যে-ইতিহাস পাওয়া যায় তার বিবেচনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা আরো বেশি হওয়া উচিত। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।—লেখক

'আদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত অন্যকোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না?" (তোমরা কি অবিশ্বাস ও পাপকর্মের পরিণামকে ভয় করো না?) তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরি করেছিলো, তারা বলেছিলো, "আমরা তো দেখছি তুমি নির্বোধ (বোকামির খপ্পরে পড়েছো) এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি।" সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়, আমি নির্বোধ নই, বরং আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসুল। আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। (আমি তোমাদেরকে আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে নসিহত করছি।) তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে তোমাদের কাছে তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে? এবং স্মরণ করো (আল্লাহর এই অনুগ্রহকে যে), আল্লাহ তোমাদেরকে নুহের সম্প্রদায়ের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক গঠনে হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ করেছেন (সচ্ছলতা ও দৈহিক শক্তি দান করেছেন)। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।" তারা বললো, "তুমি কি আমাদের কাছে এই উদ্দেশ্যে এসেছো যে আমরা যেনো এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার ইবাদত করতো (যেসব দেবতার পূজা করতো) তা বর্জন করি? তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদেরকে যার (যে-শাস্তির) ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে আসো।" সে বললো, "তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে। (তা এসেই পড়লো বলে। কারণ তোমাদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে এবং তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের হাতে সমর্পণ করছো।) তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও (আমার সঙ্গে ঝগড়া করছো) এমন কতগুলো নাম (প্রতিমা ও মূর্তি) সম্পর্কে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্টি করেছো (নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বানিয়ে নিয়েছো) এবং যে-সম্পর্কে আল্লাহ কোনো সনদ পাঠান নি? (অথচ আল্লাহ এসব মূর্তির তোমাদের উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নাযিল করেন নি?) সুতরাং তোমরা (আসন্ন সময়ের)

প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।" এরপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যারা অস্বীকার করেছিলো এবং যারা মুমিন ছিলো না (তারা কোনোকালেই ঈমান আনতো না) তাদেরকে আমি নির্মূল করেছিলাম।' [সূরা আ'রাফ : আয়াত ৬৫-৭২]

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ () يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ () وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ () قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ () إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ () مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ () إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ () فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ () وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ () وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ () وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (سورة هود)

'আর আদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই[৫০] (তাদের ভাই-বেরাদরের মধ্য থেকে) হূদকে (নবীরূপে) পাঠিয়েছিলাম। সে (তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে) বলেছিলো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্যকোনো ইলাহ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। (তোমরা তো এটা ছাড়া আর কিছু নও যে সত্যের বিপরীতে মনগড়া কাজ করছো।) হে আমার সম্প্রদায়, আমি এর (এই দাওয়াত ও প্রচারকাজের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে

---

[৫০] এখানে 'ভাই' দ্বারা স্বজাতিভাই বুঝানো হচ্ছে।

পারিশ্রমিক যাচ্ঞা করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে তারই কাছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করবে না? (এতটুকু পরিষ্কার কথাও বুঝো না?) হে আমার সম্প্রদায়, তোমারা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে (নিজেদের কৃতঅপরাধসমূহের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করো, এরপর তাঁর কাছেই ফিরে আসো (ভবিষ্যতের জন্য তাঁর কাছে তওবা করো)। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। (ফলে তোমাদের কৃষি ও খেতখামার সবুজ ও সজীব হয়ে যাবে।) তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন (নতুন নতুন শক্তি বাড়িয়ে দেবেন, ফলে তোমাদের শক্তি হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবে।) এবং তোমরা অপরাধী হয়ে (আল্লাহ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।" তারা বললো, "হে হূদ, তুমি আমাদের কাছে (তোমার নবুওতের পক্ষে) কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আনো নি, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করবার নই (আমরা কখনো এমন করবো না যে তোমার মুখের কথার আমাদের দেবতাদের পরিত্যাগ করবো) এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই। আমরা তো এটাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে।" (আমাদের কোনো উপাস্যের গযব তোমার ওপর পতিত হয়েছে, আর সে-কারণেই এ-ধরনের কথাবার্তা বলতে শুরু করেছো।) সে বললো, "আমি তো আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয়ই আমি তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা আল্লাহর শরিক করো, তাঁকে ব্যতীত। (তোমরা যাদেরকে তার শরিক সাব্যস্ত করে রেখেছো তাদের সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।) তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো; (সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যা-কিছু তদবির করতে পারো করো) তারপর আমাকে (একটুও) অবকাশ দিয়ো না। (তারপর দেখো ফল কী দাঁড়ায়।) আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ওপর। এমন কোনো জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন[৫১] নয়; (কোনো বিচরণকারী প্রাণীরই সাধ্য নেই তাঁর ক্ষমতার কবল থেকে বাইরে থাকে।) নিশ্চয় আমার প্রতিপালক

---

[৫১] এই শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে থাকা। এখানে এই শব্দগুলো রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখা।—তাফসির মানার, কাশশাফ ইত্যাদি।

আছেন (সত্য ও ন্যায়ের) সরলপথে।[৫২] (তাঁর পথ জুলুমের পথ হতে পারে না।) এরপর তোমরা (তা সত্ত্বেও তাঁর থেকে) যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (মনে রেখো যে,) আমি যা-সহ তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি, (যে-কাজের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি) আমি তো তা তোমাদের কাছে (যথাযথভাবে) পৌঁছে দিয়েছি; (আমার অধিকারে এর চেয়ে বেশি কিছু নেই।) এবং (আমি দেখতে পাচ্ছি যে,) আমার প্রতিপালক (তোমাদের ধ্বংস করে) তোমাদের থেকে ভিন্ন কোনো সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।" এব যখন আমার নির্দেশ (হুদ আ.-কে যারা অমান্য করেছিলো তাদের ধ্বংস করার নির্দেশ) এলো তখন আমি হুদ ও তার সঙ্গে যারা (সত্যের প্রতি) ঈমান এনেছিলো তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম তাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে। এই আদ জাতি (হঠকারিতা ও অবাধ্যাচরণ করে) তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন (মিথ্যা প্রতিপাদন ও) অস্বীকার করেছিলো এবং অমান্য করেছিলো তাঁর রাসুলগণকে (তাদের বিরোধিতা ও অবাধ্যাচরণ করেছিলো) এবং তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করেছিলো। এই দুনিয়াতে তাদেরকে করা হয়েছিলো লানতগ্রস্ত (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে) এবং (লানতগ্রস্ত হবে তারা) কিয়ামতের দিনেও। জেনো রাখো! আদ সম্প্রদায় তো তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিলো। জেনে রাখো! ধ্বংসই হলো আদের পরিণাম, যারা হুদের সম্প্রদায়।' [সুরা হুদ : আয়াত ৫০-৬০]

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ () فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ () وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ () وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ()

---

[৫২] অর্থাৎ তিনি সরলপথের হেদায়েত দেন এবং তাঁর প্রদর্শিত সরল পথে থাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ () هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ () إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ () إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ () قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ () قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ () فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (سورة المؤمنون)

'অতঃপর তাদের পর (নুহের কওমের পর) অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম; (অন্যান্য বহু কওমের এক নতুন যুগ সৃষ্টি করলাম) এবং তাদেরই একজনকে তাদের রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম। (তার আহ্বানও এটা ছিলো যে) সে বলেছিলো, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্যকোনো ইলাহ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? (তোমরা কুফরি ও পাপাচারের ভয়ঙ্কর পরিণামকে ভয় করো না?) তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরি করেছিলো এবং আখেরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিলো এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলাম, তারা (নিজেদের অনুগামী নিম্নস্তরের লোকদেরকে) বলতে লাগলো, "এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ; (এই রাসুল নামধারী লোকটির মধ্যে অধিক বৈশিষ্ট্য আর কিছু নেই) তোমরা যা আহার করো, সে তা-ই আহার করে এবং তোমরা যা পান করো, সেও তা-ই পান করে; যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে; (তোমরা কি শুনছো এই ব্যক্তি কী বলছে) সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে (চূর্ণবিচূর্ণ হাড়ে) পরিণত হলেও তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে? (তোমাদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্য পুনর্জীবিত করা হবে?) অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই (এখানেই আমাদের জীবন এবং এখানেই আমাদের মৃত্যু ঘটবে) এবং আমরা উত্থিত হবো না। (এটা কখনো হতে পারে না যে আমরা মৃত্যুর পর আবার জীবিত হবো) সে তো এমন এক (মিথ্যাবাদী) ব্যক্তি যে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই।" সে বললো হে আমার প্রতিপালক, আমাকে

সাহায্য করো; কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।" আল্লাহ বললেন, "অচিরেই তারা নিশ্চয় অনুতপ্ত হবে।" তারপর সত্যসত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনার মতো (খড়-কুটার মতো ধ্বংস) করে দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেলো জালিম সম্প্রদায়।' [সূরা মুমিনুন : ৩১-৪১]

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ () إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ () إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ () فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ () وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ () أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ () وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ () وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ () فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ () وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ () أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ () وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ () إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ () قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ () إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ () وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ () فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ () وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (سورة الشعراء)

'আদ সম্প্রদায় (আল্লাহর) রাসূলগণকে অস্বীকার (অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপাদন) করেছিলো। যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললো, "তোমরা কি সাবধান হবে না? (তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না?) আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসুল (রূপে প্রেরিত হয়েছি)। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি তোমাদের কাছে (এই দাওয়াত ও প্রচারকাজ)-এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছে আছে। তোমরা কি প্রতিটি উচুঁস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছো অনর্থক? (খেলতামাশার নিদর্শন বানাচ্ছো?) আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছো এই মনে করে যে তোমরা চিরস্থায়ী হবে। এবং যখন তোমরা আঘাত হানো তখন আঘাত হেনে থাকো কঠোরভাবে। (জুলুমের থাবা নিয়ে আক্রমণ করো) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ভয় করো তাঁকে যিনি তোমাদেরকে দান করেছেন সেই সমুদয়

যা তোমরা জানো। তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন আন'আম[৫৩] ও সন্তান-সন্ততি, উদ্যান ও প্রস্রবণ; আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি মহাদিবসের শাস্তির।" তারা বললো, "তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। এটা তো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব[৫৪]। (পুরাকালের লোকদের অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়।) আমরা শাস্তি প্রাপ্তদের শামিল নই।" (আমাদের ওপর কোনোদিনও আযাব আসবে না) তারপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো (অনন্তর তাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করতে লাগলো), তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম। এতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আর তোমার প্রতিপালক, নিশ্চয় তিনি মহাশক্তিশালী, দয়ালু। [সূরা শুআরা : আয়াত ১২৩-১৪০]

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ () فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (سورة حم السجدة)

'আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে দম্ভ করতো (দেশের মধ্যে অনর্থক অহংকার করতো) এবং বলতো, "আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?" (শক্তি ও ক্ষমতায় আমাদের চেয়ে অধিক কে আছে?) তার কি তবে লক্ষ করে নি যে, আল্লাহ্, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করতো। এরপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানোর জন্য (অপমানকর শাস্তির মজা টের পাওয়ানোর জন্য) তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে। আখেরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক (তা আলাদাই থেকে গেলো) এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।' [সূরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ১৫-১৬]

---

[৫৩] আন'আম দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল এবং অন্যান্য অহিংস্র ও বিচরণকারী জন্তুকে বুঝায়; যেমন : হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইত্যাদি। কিন্তু ঘোড়া, গাধা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

[৫৪] পূর্বেও কিছু ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবী করেছেন। এটা নতুন কিছু নয়।

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ () قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ () قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ () فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ () تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ () وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (سورة الأحقاف)

'স্মরণ করো, আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা (হযরত হুদ আ.-এর কথা) —যার পূর্বে ও পরেও সতর্ককারীরা এসেছিলো (এবং তাদেরও একই কথা ছিলো যা হুদ বলেছিলো)—সে তার আহকাফবাসী[৫৫] সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলো এই বলে, "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। আমি তো তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।" তারা বলেছিলো, "তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এসেছো? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা (শীঘ্রই) নিয়ে আসো।" সে বললো, "(কখন আযাব আসবে) এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহর কাছেই আছে।" আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি কেবল তাই তোমাদের কাছে প্রচার করি; কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়। (তোমরা নাফরমানি করছো।)" এরপর তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে (সেই আযাব অর্থাৎ) মেঘ আসতে দেখলো তখন বলতে লাগলো, "ওটা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে।" (আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে।) (হুদ বললো,) "এটাই তো তা, (সেই আযাব) যা তোমরা তরান্বিত করতে চেয়েছো— এক (প্রচণ্ড) ঝড়, তাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহর নির্দেশে তা সমস্তকিছুকে ধ্বংস করে দেবে।" (সবকিছুর মূলোৎপাটন করে ফেলবে।) এরপর তাদের পরিণাম এই হলো যে,

[৫৫] আহকাফ, ইয়ামানের অন্তর্গত একটি বালুকাময় উপত্যকার নাম।

তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইলো না। (তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছিলো না।) এই আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল (শাস্তি) দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে যে-প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে তা দিই নি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোনো কাজে আসে নি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিলো। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো। (তাদের ওপর আঘাত হানলো।)' [সুরা আহকাফ : আয়াত ২১-২৬]

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ () مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (سورة الذاريات)

'এবং (আল্লাহ তাআলার কুদরতের উত্তম) নিদর্শন রয়েছে আদের (ধ্বংস হওয়ার) ঘটনায়, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর (ঝঞ্ঝা)বায়ু; তা যা-কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিলো তাকেই (পুরনো পচা হাড়ের মতো) চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলো।' [সুরা আয-যারিয়াত : আয়াত ৪১-৪২]

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ () إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ () تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ () فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (سورة القمر)

'আদ সম্প্রদায় সত্য (তাদের নবীকে) অস্বীকার করেছিলো, ফলে কীরূপ ছিলো (তাদের ওপর) আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! তাদের ওপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে, মানুষকে তা উৎখাত করেছিলো উন্মূলিত খেজুর কাণ্ডের মতো। (উপড়ে-ফেলা খেজুর গাছের শেকড়েরর মতো) কী কঠোর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!' [সুরা আল-কামার : আয়াত ১৮-২১]

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ () سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ () فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (سورة الحاقة)

'আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো (ভয়ঙ্কর শীতল) প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন সাতদিন ও আটদিবস বিরামহীনভাবে; তখন তুমি (সেখানে উপস্থিত থাকলে) উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে—তারা ওখানে লুটিয়ে (চিৎপাত হয়ে) পড়ে আছে সারশূন্য খেজুরকাণ্ডের মতো। এরপর তুমি তাদের কাউকে বিদ্যমান দেখতে পাও কি?' (যে সে শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে?) [সূরা আল-হাককাহ : আয়াত ৬-৮]

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ () إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ () الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (سورة الفجر)

'তুমি কি দেখো নি তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন আদ বংশের—ইরাম গোত্রের প্রতি—যারা অধিকারী ছিলো সুউচ্চ প্রাসাদের?—[৫৬] যার সমতুল্য (বস্তু) কোনো দেশে নির্মিত হয় নি।' [সূরা আল-ফাজর : আয়াত ৬-৮]

হযরত হুদ আ.-এর ইন্তেকাল

আরববাসীরা হযরত হুদ আ.-এর ইন্তেকাল এবং তাঁর পবিত্র মাজার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের দাবি করে থাকে। হাযরামাউতের অধিবাসীরা দাবি করেন যে, আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর তিনি হাযরামাউতের উদ্দেশে হিজরত করে চলে আসেন। ওখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং বারহুত উপত্যকার কাছে হাযরামাউতের পূর্বাংশে তারিম শহরের প্রায় দুই মঞ্জিলের মাথায় তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত আলী রা. থেকে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, হযরত হুদ আ.-এর কবর হাযরামাউতের 'কাসিবে আহমার' অর্থাৎ লাল টিলার চূড়ায় অবস্থিত এবং তাঁর শিয়রে একটি ঝাউগাছ দাঁড়িয়ে আছে।

ফিলিস্তিনবাসীরা বলে তিনি ফিলিস্তিনে সমাহিত হয়েছেন। তারা ওখানে তাঁর কবর পাকা করে রেখেছে এবং ওখানে তারা বাৎসরিক ওরসও পালন করে থাকে।[৫৭]

কিন্তু এই রেওয়ায়েতগুলোর মধ্যে হাযরামাউতের রেওয়ায়েতটি শুদ্ধ ও যৌক্তিক বলে মনে হয়। কারণ, আদ সম্প্রদায়ের বসতিগুলো

---

[৫৬] ভিন্ন অর্থে তারা ছিলো স্তম্ভের মতো দীর্ঘকায় অথবা শক্তিশালী।

[৫৭] কাসাসুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা ৭৪।

হাযরামাউতের কাছাকাছি ছিলো। সুতরাং স্থানীয় সংকেত এটাই দাবি করে যে, তাদের ধ্বংসের পর হযরত হুদ আ. কাছেরই কোনো বসতিতে অবস্থান করে থাকবেন এবং মৃত্যুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকবেন। আর এই জায়গাটি হাযরামাউতেই।

কয়েকটি শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত

উল্লিখিত দীর্ঘ ঘটনায় যে-বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তা ব্যতীত আরো কিছু শিক্ষামূলক বিষয় রয়েছে যা মনোযোগ আকর্ষণ করে ও চিন্তাভাবনার দাবি রাখে।

এক.

যে ব্যক্তি আদ সম্প্রদায়ের ঘটনাগুলো পাঠ করবেন তাঁর চোখের সামনে এমন এক সত্তার কল্পনা এসে যায় যিনি গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তার মূর্তপ্রতীক। তাঁর চেহারায় ভদ্রতা ও আভিজাত্য স্পষ্টরূপে প্রকাশমান। তিনি যা-কিছু বলেন, আগে তার ওজন করে নেন—তার পরিণাম ভালো না-কি মন্দ। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কঠিন দুর্ব্যবহার, কর্কশ ভাষা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জবাব দেন ধৈর্যের সঙ্গে। এতকিছু সত্ত্বে তাঁকে তাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী দেখা যায়। ইখলাস ও নেক নিয়ত তাঁর কপাল থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। অথচ তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে বলে—

إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

"আমরা তো দেখছি তুমি নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি।"

কিন্তু তিনি তার জবাব দেন এভাবে—

يا قوم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"হে আমার সম্প্রদায়, আমি নির্বোধ নই, বরং আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসুল। আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।"

এই প্রশ্ন-উত্তর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে এদিকে যে, আল্লাহ তাআলার মনোনীত মানবগণ যখন কারো হিত কামনা করেন এবং বক্র পথের পথিকদের বক্রতা সোজা করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন, তখন

তাঁরা যেসব লোকের অভ্যন্তরীণ চক্ষু ও হৃদয় অন্ধ তাদের অর্থহীন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং হীন প্রতিপন্ন করার কোনোই পরোয়া করেন না। অন্তরে ব্যথা ও দুঃখ অনুভব করে মুখ ফিরিয়ে নেন না। অসন্তুষ্ট হয়ে হিতাকাঙ্ক্ষা ও নসিহত ত্যাগ করেন না। তাঁরা চারিত্রিক মাধুর্য, নম্রতা ও দয়ার সঙ্গে আধ্যাত্মিক রোগীদের চিকিৎসায় ব্যাপৃত থাকেন। তাঁদের এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর নসিহত ও দাওয়াত এবং হিতকামনার জন্য তাঁদের সম্প্রদায় থেকে মোটেই কোনো রকমের স্বার্থ ও বিনিময়ের প্রত্যাশা করেন না এবং তাঁদের জীবন বদলা ও বিনিময়ের একেবারেই উর্ধ্বে থাকে—

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

'আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছে আছে।' [সুরা শুআরা : আয়াত ১২৭]

দুই.

হযরত হুদ আ. দয়া ও কোমলতার সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলার একত্বের প্রতি ঈমান আনার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, আল্লাহর চিরস্থায়ী নেয়মতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগা সম্প্রদায় তা কোনোভাবেই মেনে নেয় নি। এর প্রধানতম কারণ ছিলো তাদের মূর্খতাসুলভ এই বিশ্বাস যে পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি ও প্রথা এবং তাদের নিজেদের হাতে নির্মিত প্রতিমাসমূহের মানমর্যাদার বিরুদ্ধে যে-ব্যক্তিই আওয়াজ তুলবে সেই প্রতিমাসমূহের অভিশাপে পতিত হবে। এই ধ্বংসাত্মক বিশ্বাস যেসব সম্প্রদায়ের ভেতর তার জীবাণু উৎপন্ন করে দেয়, নিজেদের সংশোধক ও সংস্কারক এবং নবী ও রাসুলের সঙ্গে সেসব সম্প্রদায়ের ব্যবহার ও আচার-আচরণ ওইরকমই হয়ে থাকে যা হযরত হুদ আ. ও নুহ আ.-এর সম্প্রদায়ের আলোচনায় দেখা যায়। সত্য ও সংশোধনকারী নবীগণের বিরোধিতাকারী সম্প্রদায়গুলোর শত্রুতা ও অবাধ্যতা এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই হয়েছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি ও প্রথা এবং আমাদের হাতে-গড়া মূর্তিগুলোর মর্যাদা ও দাপটের বিরুদ্ধে কেনো কিছু বলা হবে?

বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসকে এ-জন্যই বিষের পেয়ালা পান করতে হয়েছে যে তিনি কেনো তাঁর সম্প্রদায়ের বাতিল উপাস্যগুলোর মানমর্যাদা ও দাপট অস্বীকার করলেন, কেনো তাদের নিন্দা করলেন, সম্প্রদায়ের তরুণদেরকে কেনো বাতিল উপাস্যগুলোর বিরোধী বানান। সুতরাং, এই অপবিশ্বাসের জীবাণু সম্প্রদায়গুলোর আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য সবসময়ই ক্ষতিকারক এবং চিরস্থায়ী কল্যাণ ও সৌভাগ্যের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে থেকেছে।

তিন.

হযরত হূদ আ. এবং অন্য নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) এই রীতি একটি উত্তম আদর্শ যে, দাওয়াত ও সত্য প্রচারের পথে দুর্ব্যবহার ও অশিষ্টাচারের বদলা সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে দেয়া হোক। আর কর্কশ ও কঠোর কথা জবাব মধুর বাণী দ্বারা পূর্ণ করা হোক। অবশ্য দীনের প্রচারক তাদের অবিরাম পাপাচার ও অনবরত অবাধ্যাচরণের ওপর আল্লাহ তাআলার রচিত কর্মফল-সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন তাদেরকে অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং ভবিষ্যতের নিকৃষ্ট ও ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে নিশ্চিতভাবে সতর্ক করে দেবেন। তাদের সামনে এই সত্য বার বার তুলে ধরবেন যে, যখন কোনো সম্প্রদায় সমষ্টিগতভাবে জুলুম, অবাধ্যতা ও বিরোধিতার ওপর উদ্যত হয় এবং অনবরত তার ওপর হঠকারিতা করতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও গযব তাদেরকে বিশ্বের অস্তিত্বের জগৎ থেকে মুছে ফেলে এবং আল্লাহ ভিন্ন সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। যেমন : হযরত নূহ আ.-এর সম্প্রদায় এবং হযরত হূদ আ.-এর সম্প্রদায় এ-বক্তব্যের শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত।

হযরত সালেহ্ আলাইহিস সালাম

কুরআন মাজিদে হযরত সালেহ আ.-এর উল্লেখ

কুরআন মাজিদের মোট আট জায়গায় হযরত সালেহ আ.-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত সংখ্যাগুলো তার সত্যায়ন করছে।

সুরা	সুরার নাম	আয়াত
৭	সুরা আ'রাফ	৭৩, ৭৫, ৭৭
১১	সুরা হুদ	৬১, ৬২, ৬৬, ৮৯
২৬	সুরা শুআরা	১৪২

হযরত সালেহ আ. যে-সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন তার নাম সামুদ। কুরআন মাজিদের নয়টি সুরায় সামুদের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা : সুরা আ'রাফ, সুরা হুদ, সুরা হিজর, সুরা সুরা নামল, সুরা হা-মীম আস-সাজদা, সুরা আন-নাজম, সুরা আল-কামার, সুরা আল-হাককাহ, সুরা আশ-শামস।

হযরত সালেহ আ. ও সামুদের বংশ-পরিচয়

বংশতত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কিত উলামায়ে কেরামকে সামুদ সম্প্রদায়ের নবী হযরত সালেহ আ.-এর বংশ-পরিচয়ের বর্ণনা বিভিন্ন মতের অনুসারী দেখা যাচ্ছে। বিখ্যাত হাফেজে হাদিস ইমাম বাগাবি রহ. হযরত সালেহ আ.-এর বংশ-পরিচয় বর্ণনা করেছেন এভাবে : সালেহ বিন উবাইদ বিন আসিফ বিন মাশিহ বিন উবাইদ বিন হাদির বিন সামুদ। আর বিখ্যাত তাবেয়ি ওহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. যা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ : সালেহ বিন উবাইদ বিন জাবির বিন সামুদ।[৫৮]

যদিও ইমাম বাগাবি রহ. সময়ের হিসেবে ওহাবের চেয়ে অনেক পরবর্তীকালের মানুষ এবং ওহাব বিন মুনাব্বিহ তাওরাতের অনেক বড় আলেম, তারপরও বাগাবি হযরত সালেহ থেকে সামুদ পর্যন্ত যে-শৃঙ্খলা জুড়েছেন, বংশতত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কিত আলেমদের কাছে তা ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রবল ও সত্যসংলগ্ন।

---

[৫৮] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আ'রাফ।

এই বংশপরম্পরা থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সে-সম্প্রদায়কে হযরত সালেহ আ. যার একজন সদস্য সামুদ বলা হয় এ-কারণে যে, সেই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষের নাম সামুদ এবং এই সম্প্রদায় বা গোত্র তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সামুদ থেকে হযরত নুহ আ. পর্যন্ত বংশপরম্পরা সম্পর্কে দুই ধরনের মত রয়েছে : ১. সামুদ বিন আমির বিন ইরাম বিন সাম বিন নুহ আ.; ২. সামুদ বিন আদ বিন আওস বিন ইরাম বিন সাম বিন নুহ আ.।

সাইয়িদ মাহমুদ আলুসি রহ. তাফরিসে রুহুল মাআনিতে বলেন, 'ইমাম সালাবি দ্বিতীয় মতটিকে প্রবল মনে করেন।'[৫৯]

যাইহোক, বিভিন্ন রেওয়ায়েতের ঐকমত্যে এ-কথা প্রমাণিত হয় যে সামুদ সম্প্রদায়ও সামের বংশধরগণের একটি শাখা এবং সম্ভবত, বরং নিশ্চিতরূপেই বলা যায়, এঁরাই সেসব লোক যারা ১ম আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার সময় হযরত হুদ আ.-এর সঙ্গে রক্ষা পেয়েছিলেন এবং এই বংশই দ্বিতীয় আদ নামে পরিচিত। আর সন্দেহাতীতভাবে এই সম্প্রদায়ই 'আরবে বায়িদা' (ধ্বংসপ্রাপ্ত আরব বংশ)-এর অন্তর্গত।

সামুদ সম্প্রদায়ের বসতিসমূহ

সামুদ সম্প্রদায় কোথায় বসবাস করতো এবং পৃথিবীর কোনা অংশে তারা ছড়িয়েছিলো—এ-সম্পর্কে মীমাংসিত বক্তব্য এই যে, তাদের বসতিগুলো হিজর নামক স্থানে অবস্থিত ছিলো। হিজায ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে 'ওয়াদিউল কোরা' পর্যন্ত যে-প্রান্তরটি দেখা যায়, এ-সবই তাদের আবাসস্থল ছিলো। বর্তমানে তা 'ফাজ্জুন নাকাহ' (فج الناقة) নামে প্রসিদ্ধ। সামুদ সম্প্রদায়ের বসতিগুলোর ধ্বংসাবশেষ এবং তার চিহ্নসমূহ আজো বিদ্যমান। এ-যুগেও কোনো কোনো মিসরীয় তত্ত্বজ্ঞানী এগুলো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, তাঁরা এমন একটি বাড়িতে প্রবেশ করেছেন যাকে 'শাহি হাবিলি' বা রাজকীয় প্রাসাদ বলা হতো। এই প্রাসাদে অনেকগুলো কক্ষ আছে এবং প্রাসাদের সংলগ্ন অনেক বড় একটি হাউজ আছে এবং গোটা বাড়িটি পাহাড় কেটে নির্মাণ করা হয়েছে।

---

[৫৯] রুহুল মাআনি, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৪।

আরবের বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাসউদি[৬০] লিখেছেন—

وركهم باقية و اثارهم بادية في طريق من ورد من الشام (ج 3 ص 139)

'যে-ব্যক্তি সিরিয়া থেকে হিজাযে আগমন করে তার পথপার্শ্বে সামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতিসমূহের ভগ্নাবশেষ এবং তার প্রাচীন চিহ্নসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়।' ১৩৯

হিজরের এ-স্থানটি—যা হিজরে সামুদ বলে পরিচিত—মাদায়িন শহর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এমনভাবে অবস্থিত যে তার সামনে রয়েছে আকাবা উপসাগর। যেভাবে আদ সম্প্রদায়কে 'আদে-ইরাম' বলা হয়েছে (এমনকি কুরআন মাজিদ ইরাম শব্দটিকে তাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশেষণই বানিয়ে দিয়েছে), তেমনি আদে-ইরামের ধ্বংসের পরবর্তী সম্প্রদায়কে 'সামুদে-ইরাম' বা দ্বিতীয় আদ বলা হয়েছে।

প্রাচ্য, বিশেষ করে আরব সম্পর্কে ইউরোপের প্রাচ্যবিদগণ[৬১] যেভাবে তাঁদের ইতিহাস-বিষয়ক জ্ঞানের গভীরতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণের নামে ভ্রান্ত দাবি উত্থাপনে অভ্যস্ত থেকেছেন, তেমনিভাবে তাঁরা সামুদ সম্প্রদায়কেও তাঁদের গবেষণার অনুশীলনী-শ্লেট বানিয়েছেন। তাঁদের প্রশ্ন হলো, সামুদের মূল কী এবং কোথায়? তাদের আবির্ভাব কখন এবং কোন যুগে ঘটেছে? এসব প্রশ্নের

---

[৬০] তাঁর পুরো নাম : আবুল হাসান আলি বিন হুসাইন বিন আল-মাসউদি। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিসরের ফুসতাত শহরে ৩৪৬ হিজরি মোতাবেক ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বংশপরম্পরা বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই তাঁকে মাসউদি বলা হয়। তিনি ভারত, চীন, সারনাদিব, পূর্ব আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চল, ফিলিস্তিন, তুরস্ক, জাযিরাতুল আরব ইত্যাদি ভূখণ্ড ভ্রমণ করেন। অবশেষে ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মিসরে যান। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

مروج الذهب، أخبار الأمم من العرب والعجم، التنبيه والإشراف، أخبارالزمان ومن اباده الحدثان

শেষের গ্রন্থটি তিন খণ্ডে রচিত।

[৬১] ইউরোপের যেসব পণ্ডিত প্রাচ্যের ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ পোষণ করেন এবং সেসব বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁদেরকে প্রাচ্যবিদ বলা হয়। তাঁদের কেউ কেউ যদিও সত্যিকার অর্থেই বিচক্ষণতা ও দক্ষতার অধিকারী, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই কেবল অনুমান ও ধারণানির্ভর, এমনকি অনেক সময় মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করে প্রাচ্য সম্পর্কে বাড়াবাড়ি বা তাঁদের অল্পবিদ্যার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

উত্তরে তাঁরা দুই দলে বিভক্ত হয়েছেন। একদল বলেন, সামুদ ইহুদিদের একটি সম্প্রদায় ছিলো। তারা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে নি; বরং এখানেই বসতি স্থাপন করেছিলো। কিন্তু এই বক্তব্য কেবল তথ্যবহির্ভূত নয়; বরং চূড়ান্তভাবে ভ্রান্তিপূর্ণ। কেননা, সকল ইতিহাসবেত্তা এ-বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলকে নিয়ে মিসর থেকে বের হওয়ার অনেক আগেই সামুদ সম্প্রদায়ের বসতিগুলো ধ্বংস ও হেজেমজে গিয়েছিলো এবং তাদের মূলোৎপাটিত করে দেয়া হয়েছিলো। তা ছাড়া কুরআন মাজিদও স্পষ্ট বর্ণনা করছে যে, যখন মুসা আ.-কে ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় অবিশ্বাস করলো, তখন ফেরআউনেরই বংশধরদের মধ্য থেকে একজন মুমিন ব্যক্তি তাঁর সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন এই কথা বলে—'তোমাদের এই মিথ্যা-প্রতিপাদনের পরিণাম কখনো যেনো এমন না হয় যা তোমাদের পূর্বে হযরত নুহ আ.-এর সম্প্রদায়, আদ ও সামুদ এবং তাদের পরবর্তী সম্প্রদায়গুলোর তাদের নবীদেরকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপাদনের কারণে হয়েছিলো।

প্রাচ্যবিদদের দ্বিতীয় দল বলেন, এরা (সামুদ সম্প্রদায়) আমালিকা সম্প্রদায়ের একটি শাখা ছিলো এবং ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরের বসতি ত্যাগ করে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলো।

তাঁদের মধ্যে কারো কারো ধারণা, এরা আমালিকা সম্প্রদায়ের একটি দল, যাদেরকে মিসরের বাদশাহ আহমাস মিসর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তারা মিসরে অবস্থানকালে পাথর কেটে গৃহনির্মাণ শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিলো। এ-কারণে তারা হিজরে গিয়ে পাহাড় ও পাথর কেটে অনুপম প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করলো এবং সাধারণ প্রচলিত নিয়মেও বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করলো।

কিন্তু আমরা আদ সম্প্রদায়ের ঘটনায় এ-কথা প্রমাণ করে এসেছি যে, আদ ও সামুদ উভয় সম্প্রদায়ই সামের বংশধরভুক্ত। আর এটাও প্রমাণ করেছি যে, আরববাসীগণ কেবল ইহুদিদের ভুল অনুসরণের কারণে এদেরকে আমালিকা সম্প্রদায়ভুক্ত বলে ফেলে, অথচ এই বংশের সঙ্গে আমলিক বিন উদের কোনোই সম্পর্ক পাওয়া যায় না। সুতরাং, এ-ধরনের বক্তব্য ঠিক নয়।

এসব মতের বিপরীতে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীদের মত এই যে, সামুদ সম্প্রদায় হযরত হুদ আ.-এর সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়েরই অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ,

যাঁরা হুদ আ.-এর সঙ্গে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এটাই বিশুদ্ধ ও প্রবলতম মত। আর হাযরামাউতবাসীর দাবি—সামুদ সম্প্রদায়ের বসতি ও অট্টালিকাগুলো আদ সম্প্রদায়েরই কারিগরি ও শিল্পবিদ্যার ফল—এ-উক্তিটির বিরোধী নয় যে, সামুদ সম্প্রদায় অট্টালিকা নির্মাণশিল্পে বিশেষ দক্ষ ও পরাদর্শী ছিলো এবং তাদের সময়ের ওই অট্টালিকাগুলো তাদের নিজেদের হাতেই নির্মিত। কেননা, প্রথম আদ আর দ্বিতীয় আদ সবসময় আদই বটে। হযরত সালেহ আ. তাঁর সম্প্রদায়ে যে-সম্বোধন করেছিলেন তাও এ-কথা সমর্থন করে—

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

(سورة الأعراف)

'স্মরণ করো, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।' [সূরা আ'রাফ : আয়াত ৭৪]

বাকি থাকলো সামুদ সম্প্রদায়ের যুগ সম্পর্কিত বিষয়টি। এ-সম্পর্কে মীমাংসাকারী কোনো নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা যায় না। কারণ, ইতিহাস এ-ব্যাপারে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি। অবশ্য নিশ্চিতভাবে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তাদের যুগ হযরত ইবরাহিম আ.-এর পূর্বেকার যুগ। তারা এই মহান মর্যাদার অধিকারী নবীর নবুওতপ্রাপ্তির অনেক আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

এটাও লক্ষণীয় বিষয় যে, সামুদ সম্প্রদায়ের বসতিগুলোর কাছাকাছি এমন কতগুলো সমাধি পাওয়া যায়, যেগুলোর গায়ে 'আরমি' ভাষায় উৎকীর্ণ ফলক সংযোজিত রয়েছে। এই সমাধিফলকগুলোতে যে-তারিখ খোদিত রয়েছে তা হযরত ইসা আ.-এর জন্মের পূর্বেকার। সুতরাং, এতে এই ভুল ধারণা জন্মে যে, এই সম্প্রদায়টি হযরত মুসা আ.-এর পরে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। অথচ বিষয়টি এরকম নয়।

এগুলো আসলে ওইসব লোকের সমাধি যারা এই সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার হাজার হাজার বছর পর ঘটনাক্রমে এখানে এসে বসবাস

করেছিলো। তারা পূর্বপুরুষদের প্রাচীনতার নিদর্শন প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে 'আরামি' বর্ণমালায় (যা বহু প্রাচীন যুগের বর্ণমালা) তাদের ফলকগুলো লিখে সমাধিগাত্রে লাগিয়ে দিয়েছিলো, যাতে প্রাচীনকালে স্মৃতি রক্ষিত থাকে। এই সমাধিগুলো সামুদ সম্প্রদায়েরও নয় এবং তাদের যুগও এটা নয়।

মিসরের বিখ্যাত খ্রিস্টান ইতিহাসবেত্তা জর্জি যায়দান[৬২] তাঁর রচিত 'আল-আরব কাবলাল ইসলাম' গ্রন্থে প্রায় এমনই লিখেছেন। তিনি বলেছেন :

'স্মৃতিচিহ্ন ও সমাধিফলকসমূহ পাঠ করলে যা কিছু প্রকাশ পায় তা এই—হযরত সালেহ আ.-এর সম্প্রদায়ের বসতিগুলো হযরত ইসা আ.-এর জন্মের কিছুকাল আগে নাবতিদের ক্ষমতাধীন চলে এসেছিলো। নাবতিরা 'বতরা' নামক স্থানের অধিবাসী ছিলো। (অচিরেই এই গ্রন্থে তাদের বিবরণ আসবে।) এবং তাদের বসতির চিহ্ন ও টিলাসমূহ অনেক প্রাচ্যবিদ নিজের চোখে দেখেছেন। এই গ্রন্থের সূচনায় এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রাচ্যবিদগণ তাদেরই (নাবতিদের) স্মৃতিচিহ্নসমূহ পাঠ করেছেন, যা পাথরের গায়ে খোদিত ছিলো। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধ্বংসাবশেষ হলো যেগুলো 'কাসরে বিনত', 'কবরে পাশা', 'কালআহ', ও 'বুরজ' নামে নামকৃত। ধ্বংসাবশেষের পাথরগুলোর ওপর যা-কিছু লেখা রয়েছে তা নাবতি অক্ষরে লিখিত। আর এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি বা সবকটি সেই লিপিমালাই যা বিভিন্ন সমাধিগাত্রে লিখিত রয়েছে।'

---

[৬২] জর্জি হাবিব যায়দান (جرجي حبيب زيدان) : ১৮৬১ সালে বয়রুতে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু মিসরে বেড়ে ওঠেন এবং ওখানেই বসবাস করেন। তিনি আরবি ছাড়াও ফরাসি, ইংরেজি ও সুরিয়ানি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : تاريخ التمدن الإسلامي (1902م)؛ العرب قبل الإسلام (1908م)؛ بناة النهضة العربية। কিন্তু তিনি খ্যাতি অর্জন করেন মূলত ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস লিখে। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা বিশ। তাঁর বিখ্যাত দুটি উপন্যাস : فتح الأندلس؛ صلاح الدين الأيوبي। তিনি ১৯১৪ সালে কায়রোতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রাচ্যবিদগণ এখানে যা-কিছু পেয়েছেন, তার মধ্যে নিম্নরূপ একটি সমাধিফলক রয়েছে, যা পাথরের গায়ে নাবতি বর্ণে উৎকীর্ণ এবং হযরত ইসা আ.-এর জন্মের অনতি পূর্বেকার লেখা।

উৎকীর্ণ বাক্যের সারমর্ম এই :

'মাকবারা কুমকুম বিনতে ওয়ায়েলাহ বিনতে হারাম' (কুমকুম বিনতে ওয়ায়েলাহ বিনতে হারাম-এর সমাধি) এবং কুমকুমের কন্যা কালিবাহ নিজের ও নিজের সন্তানদের জন্য নির্মাণ করেছেন। এর নির্মাণকাজ খুব বরকতময় মাসে শুরু করা হয়েছে। এটা নাবতিদের বাদশাহ হারেসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার নবম বছর। ইনি সেই হাসের যিনি তার গোত্রের প্রতি সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা রাখেন।

সুতরাং, عمی ذو الشری و عرشه?[৬৩] লাত, আমনাদ, মানুত ও কায়েসের অভিশাপ বর্ষিত হোক ওই ব্যক্তির ওপর যে এই সমাধিগুলোকে বিক্রি করে দেবে বা দায়বদ্ধ রাখবে, অথবা সমাধি থেকে কোনো দেহ বা অঙ্গ বের করবে, কিংবা এখানে কুমকুম, তার কন্যা ও তার সন্তানদের ব্যতীত অন্য কাউকে দাফন করবে।

সমাধিফলকে যা-কিছু লিখিত হয়েছে কেউ যদি তার বিপরীত কিছু করে তাহলে তার ওপর 'যুশ শরা', 'হুবাল' ও মানুষের পাঁচটি অভিশাপ বর্ষিত হোক। আর কোনো যাদুকর যদি তার বিপরীত কিছু করে তাহলে তার ওপর এক হাজার হাবসি দিরহাম জরিমানা আবশ্যক হবে। কিন্তু যদি তার হাতে কুমকুম, কাবিলাহ কিংবা তার বংশধরদের মধ্য থেকে কারো হাতের লিপিকা থাকে, যাতে এই অনাত্মীয় ব্যক্তির সমাধির জন্য পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় অনুমোদন থাকে এবং তা আসল হয়, নকল না হয় (তবে এই জরিমানা আবশ্য হবে না)। এই সমাধিস্থান ওয়াহবুল লাত বিন উবাদা নির্মাণ করেছে।

সামুদ সম্প্রদায়ের ধর্ম

সামুদ সম্প্রদায় তাদের মূর্তিপূজক পূর্বপুরুষদের মতো মূর্তিপূজক ছিলো। তারা এক আল্লাহ তাআলা ব্যতীত বহু বাতিল উপাস্যের পূজা

---

৬৩ ফলকে উৎকীর্ণ এই আরবি বাক্যটি পরিষ্কার পড়া যায় নি। তাই শব্দগুলো অবিকল তুলে দেয়া হলো।

করতো এবং শিরকে লিপ্ত ছিলো। তাই তাদের সংশোধন এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরই গোত্র থেকে হযরত সালেহ আ.-কে উপদেশ প্রদানকারী নবী ও রাসুল বানিয়ে পাঠানো হলো, যেনো তিনি তাদেরকে সৎপথে নিয়ে আসেন। তাদেরকে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেসব নেয়ামত তারা সবসময় ভোগ করছে। আর তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেন যে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি বস্তু আল্লাহ তাআলার একত্ব ও অদ্বিতীয়তার সাক্ষ্য বহন করছে। বিশ্বস্ত দলিল ও নিরুত্তরকারী প্রমাণসমূহের মাধ্যমে তাদের চোখের সামনে তাদের পথভ্রষ্টতা তুলে ধরেন এবং বলেন যে ইবাদত-বন্দেগির যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়।

কুরআন মাজিদে কাহিনিগুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য

কুরআন মাজিদের নিয়ম এই যে, তা মানুষের হেদায়েতপ্রাপ্তির জন্য অতীতকালের সম্প্রদায়সমূহ এবং তাদের সৎপথে প্রদর্শনকারীদের ঘটনা ও অবস্থাবলি বর্ণনা করে নসিহত ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ প্রস্তুত করে দেয়। কুরআনের আলোচ্য বিষয় কিচ্ছা-কাহিনি বর্ণনা করা নয়; বরং এটা বলা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলা যখন মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করেছেন, তখন তার হেদায়েত ও সৎপথপ্রাপ্তি এবং আখেরাতের মুক্তির জন্য কী কী উপকরণের ব্যবস্থা করলেন, যাতে সে ওই উপকরণসমূহের সাহায্যে নিজের জ্ঞান ও বিবেকের মাধ্যমে কার্য সম্পন্ন করতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়গুলো চিনতে পারে? কুরআন বর্ণনা করেছে, আল্লাহর এই রীতি প্রচলিত আছে যে, তিনি মানুষের হেদায়েতের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে নবী ও রাসুল প্রেরণ করে থাকেন। নবী-রাসুলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের মানুষকে আল্লাহর পথ বাতলে দেন এবং সব ধরনের পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় শিখিয়ে দেন। আর তার সমর্থনে প্রাচীনকালের সম্প্রদায় ও উম্মতগণের ঘটনাবলি এবং অতীতকালের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেন। যাতে এটা জানা যায় যে, সে-সব সম্প্রদায় ও উম্মত তাদের নবী-রাসুলের হেদায়েত ও নসিহত মেনে নিয়েছে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য ও সফলতা লাভ করেছে। আর যেসব উম্মত তাঁদের শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে নি; বরং তাঁদেরকে বিদ্রূপ করেছে

এবং মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে, এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্য রাসুলের সত্যায়নের জন্য কখনো নিজ থেকেই কখনো বা কওমের দাবি করার পর এমন নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছেন যা নবী ও রাসুলগণের সত্যায়নের কারণ হয়েছে এবং মুজিযা নামে আখ্যায়িত হয়েছে। কিন্তু সেই নিদর্শন ও মুজিযা প্রত্যক্ষ করার পরও কওম যখন অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপাদন ত্যাগ করে নি এবং শত্রুতা ও বিরোধিতাবশত অবিশ্বাসের ওপরই অটল থাকে, আল্লাহ তাআলার আযাব এসে তাদেরকে ধ্বংস ও মূলোৎপাটন করে দেয়। আর তাদেরই ঘটনাবলিকে ভবিষ্যতে আগমনকারী সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের উপকরণ বানিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (سورة القصص)

'তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না ওগুলোর কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করার জন্য রাসুল প্রেরণ না করে এবং আমি জনপদসমূহ তখনই ধ্বংস করি যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে।' [সুরা কাসাস : আয়াত ৫৯]

মুজিযার স্বরূপ

অক্ষম ও অপারগ করে দেয় এমন বস্তুকে অভিধানে মুজিযা বলা হয়। আর ইসলামি পরিভাষায় তা এমন কর্মের নাম, যা নবীর মাধ্যমে কোনো কারণ ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করে। সাধারণ কথাবার্তায় একে 'খারকে আদত' অর্থাৎ অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কর্মও বলা হয়। এ-কারণে এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার নীতি (যাকে প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মও বলা হয়) ভঙ্গ হওয়া কি সম্ভব? অন্যকথায় এ-প্রশ্নটি এভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে যে আল্লাহর নিয়ম-কানুনে পরিবর্তন ঘটা কি সম্ভব হতে পারে?

এই প্রশ্নের জবাব এই : মুজিযা শব্দটিকে 'খারকে আদত' অর্থাৎ অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কর্ম বলা হয়—এই অভিব্যক্তি ভুল। কারণ আল্লাহ তাআলার কুদরতের কানুন বা প্রকৃতিক রহস্যসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। সাধারণ অভ্যাস ও বিশেষ অভ্যাস। সাধারণ অভ্যাস বলতে কুদরতের ওইসব কানুন উদ্দেশ্য যা কার্যকারণ ও উপকরণের শৃঙ্খলে

আবদ্ধ। যেমন : আগুন দহন করে, পানি আর্দ্রতা সৃষ্টি করে ইত্যাদি। আর বিশেষ অভ্যাসের অর্থ এই : কারণ ও উপকরণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী কুদরতের হাত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে কারণ ও উপকরণের মধ্যস্থিত সম্পর্ককে কোনো বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যার ফলে কারণ ও উপকরণ উভয়টি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বস্তুটির অস্তিত্ব হয় না, কিংবা কোনো কারণ ছাড়াই বস্তুটি অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন : দহনের কারণ (আগুন) বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনো বস্তু আগুনে দগ্ধ না হওয়া অথবা দুই-তিন জন মানুষের উপযোগী খাদ্য দিয়ে শ-দুইশো লোকের তৃপ্তিসহকারে আহার করা এবং সেই খাবার যে-পরিমাণ সে-পরিমাণই অবশিষ্ট থাকা।

সাধারণ দৃষ্টিতে এ-দুটি বিষয়ই যেহেতু কুদরতের (স্বাভাবিক) নিয়মের বিরোধী, তাই এ-রকম বা এর অনুরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা গেলে অথবা কোথাও এমন ঘটনা ঘটেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেলে বলা হয়ে থাকে যে, এটা কুদরতের নিয়ম-কানুনের বা আল্লাহর নীতির বিরোধী। অথচ ব্যাপারটি তা নয়; বরং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলির প্রথম প্রকার। অর্থাৎ তা সাধারণ অভ্যাসের তো বিপরীত; কিন্তু বিশেষ অভ্যাসের বিপরীত নয়। সেটাও কুদরতের নিয়ম-শৃঙ্খলের একটি কড়া, যা সাধারণ অবস্থাবলি থেকে ভিন্ন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আর মুজিযার ক্ষেত্রে সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটি থাকে এই—এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ও রাসুলগণের সত্যতা ও যথাযথতা সত্যায়ন করেন এবং মিথ্যা প্রতিপাদনকারীদের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেন যে, যদি এই নবুওতের দাবিদার ব্যক্তি তাঁর দাবিতে সত্যবাদী না হতেন, তাহলে আল্লাহর সাহায্য কখনো তার সঙ্গী হতো না। সুতরাং সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে ভিন্ন রাসুল ও নবীগণের যে-কাজটি প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে তা তাঁদের কাজ নয়; বরং তা আল্লাহ তাআলার কাজ, যা তাঁর বিশেষ নিয়ম-নীতির আকারে নবীর হাতে প্রকাশ পেয়েছে, যা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হতে পারে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি কোনো নবীকে মুজিযা প্রদান না করা হতো, তবে নবীর নবুওতি জীবন, সত্য ও হেদায়েতের কিতাবের বিদ্যমানতা এবং যৌক্তিক দলিল ও প্রমাণাদির আলোকে তাঁর সত্যতার ওপর ঈমান আনা অবশ্যই জরুরি হতো এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ধর্মীয়

পরিভাষায় কুফর ও খোদাদ্রোহিতা বলে বিবেচিত হতো। তারপরও এটা একান্ত সত্য কথা যে, উদীয়মান সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল যৌক্তিক ও কিতাবি দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ শ্রেণির লোকদের প্রকৃতি ও স্বভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে হক ও সত্য বিষয়কে গ্রহণ করার জন্যও প্রমাণের চেয়ে অধিক এমনসব বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, যা বিবেক-বুদ্ধিকে বিচলিত ও মস্তিষ্ককে ভীতসন্ত্রস্ত করে তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয় যে, নবুওতের দাবির সঙ্গে নবীর এই কাজটি আল্লাহ্প্রদত্ত এমন এক শক্তি ধারণ করে যার মোকাবিলা করা মানবিক সাধ্যের বাইরে এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে তারা অক্ষম ও অপারগ। আর তারা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে নেয় যে, নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ-কারণে তিনি যা-কিছু বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেন। সুতরাং, এ-পর্যায়ে পৌঁছে যুক্তিবাদীদের এই উক্তি—মুজিযা নবুওতের দলিল নয়— সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল। এতে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা প্রতিপাদন করা হয়, যা কোনোভাবেই ঈমানের আলামত নয়।

সারকথা হলো, যে-পর্যন্ত নবী-রাসুলগণ মুজিযা প্রদর্শন না করেন, নবী ও রাসুলের সত্যতা তার ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু যদি অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারীদের দাবি করার পর অথবা নবী নিজ থেকেই মুজিযা প্রদর্শন করেন, তবে সে-মুজিযা নিঃসন্দেহে নবুওতের দলিল হবে। মুজিযাকে অবিশ্বাস করা সত্য ও বাস্তবকে অবিশ্বাস করা এবং কুফর ও খোদাদ্রোহিতা বলে আখ্যায়িত হবে।

সুতরাং, প্রত্যেক বিশেষ ও সাধারণ মানুষের জন্য এই বিশ্বাস রাখা জরুরি যে, নবী ও রাসুলগণ থেকে যেসব মুজিযা দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত ও অকাট্য বলে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোর প্রতি ঈমান আনবে এবং সেগুলোর অস্তিত্ব ও সত্যতা স্বীকার করবে। তা এ-কারণে যে, এসব মুজিয়ার কোনো একটিকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে অস্বীকার করা।

অবশ্য এ-সত্যটিও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, কোনো ব্যক্তি থেকে এ-ধরনের অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্য সংঘটিত হওয়ার নাম মুজিযা নয় এবং শুধু এ-ধরনের কাজ প্রকাশ করলেই সে নবী হতে পারে না। কেননা, নবী ও রাসুলের জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক বিষয় এই যে, তাঁর গোটা জীবন এমনভাবে যাচাই ও নিরীক্ষার কষ্টিপাথরে নিরীক্ষিত হতে

হবে, যেনো তাঁর জীবনের কোনো একটি শাখা ত্রুটিপূর্ণ এবং অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার যোগ্য না হয়। বরং তাঁর গোটা জীবনের মধ্যে চারিত্রিক উৎকর্ষ, পাপকার্য থেকে পবিত্রতা এবং কথা ও কাজের সততা পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যেতে হবে। তারপর এমন ব্যক্তি যদি নবুওতের দাবি করেন এবং নিজের দাবির সত্যতা প্রমাণে যৌক্তিক ও জ্ঞানানুগ দলিল-প্রমাণ ছাড়াও আল্লাহর নিদর্শনসমূহ (মুজিযাসমূহ)ও পেশ করে, তবে নিঃসন্দেহে তিনি নবী এবং তাঁর এই কাজ মুজিযা।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, মুজিযা প্রকৃতপক্ষে নবীর নিজের কাজ নয়; বরং তা আল্লাহ তাআলার কাজ, যা নবীর হাতে প্রকাশিত হয় এবং মুজিযা নামে আখ্যায়িত হয়। তা এই কারণে যে, নবী ও রাসুলগণ মানুষই হয়ে থাকেন। আর কোনো মানুষের সাধ্য নেই যে আল্লাহর সাধারণ বা বিশেষ নিময়-কানুনে হস্তক্ষেপ করে। এটা তো আল্লাহ তাআলার মর্জির ওপর নির্ভর করে যে, তিনি ইচ্ছা করলে এবং অবস্থা ও সময়ের চাহিদা অনুসারে নবী ও রাসুলের হাতে এমন কাজ প্রকাশ করে দেন, যা তাঁর বিশেষ রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লাহ যদি না চান, তাহলে নবী ও রাসুলের পক্ষেও সে-ধরনের কাজ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

বদর যুদ্ধে যখন তিনশো তেরজন মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক হাজার শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করলো তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি এক মুষ্টি ধুলো নিক্ষেপ করলেন। যার ফলে প্রতিটি শত্রু-সৈন্যের চোখে ধুলোকণা ঢুকে গেলো এবং তারা অস্থির হয়ে চোখ মুছতে লাগলো। এই ঘটনাকে কুরআন মাজিদ যে-সংক্ষিপ্ত আকারে ও মুজিযারূপে বর্ণনা করেছে তা আমাদের উপরিউক্ত দাবির শক্তিশালী ও অকাট্য প্রমাণ।

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

'(হে মুহাম্মদ,) তুমি নিক্ষেপ করো নি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছো (সেই এক মুষ্টি ধুলি); বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।' [সুরা আনফাল : আয়াত ১৭]

চিন্তা করুন, এখানে নবীর এই কাজটিকে (যা তার হাতেই সম্পন্ন হয়েছিলো) কেমন বিচিত্ররূপে মুজিযা সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, হে নবী, একমুষ্টি ধুলো নিঃসন্দেহে আপনার হাতের মাধ্যমেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। কারণ তা আপনার হাতেই ছিলো। কিন্তু একমুষ্টি ধুলোর এই ক্রিয়া—শত্রু-সৈন্যদের সারিগুলো দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকা সত্ত্বেও

এবং তাদের সংখ্যা এত অধিক হওয়ার পরও তাদের সবার চোখেই ধুলোকণা ঢুকিয়ে দেয়া—আপনার হাত দ্বারা সম্ভব ছিলো না। এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই কাজ। তাঁরই কুদরতের হাত এসব জটিলতাকে সহজ করে সেই এক মুষ্টি ধুলোকেই এই অবস্থায় পৌঁছে দিলো যে, শত্রুপক্ষের গোটা সেনাবাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলো।

এটাই প্রকৃত সত্য, যা আপনাদের এভাবে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, মুজিযা নবীর নিজের কাজ নয়; বরং তা সরাসরি আল্লাহরই কাজ হয়ে থাকে। যা নবীকে সাহায্য করার জন্য নবীর হাতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ-বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (سورة المؤمن)

'আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসুল প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাদের কারো কারো কথা তোমার কাছে বিবৃত করেছি এবং তাদের কারো কারো কথা তোমার কাছে বিবৃত করি নি। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রাসুলের কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ এলে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে। আর মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' [সুরা মুমিন : আয়াত ৭৮]

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (سورة الأنعام)

'তারা (দৃঢ়তার সঙ্গে) আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের কাছে যদি কোনো নিদর্শন (মুজিযা) আসতো তাহলে তারা অবশ্যই তাতে ঈমান আনতো। (হে মুহাম্মদ) বলো, নিদর্শন তো আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত (তা তার কুদরতের আওতায় রয়েছে)। (হে মুসলমানগণ, শোনো,) তাদের কাছে নিদর্শন এলেও যে তারা ঈমান আনবে না তা কীভাবে তোমাদের বোধগম্য করানো যাবে।' [সুরা আন'আম : আয়াত ১০৯]

মুজিযা সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনা সেই ব্যক্তির জন্যই তৃপ্তির কারণ হবে, যিনি এই মৌলিক আকিদায় বিশ্বাসী যে, যাবতীয় বস্তুর ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়; কোনো স্রষ্টা বস্তুরাশির মধ্যে তা

সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সুতরাং, যে-ব্যক্তি এই আকিদায় বিশ্বাসি, তিনি সহজেই বুঝতে পারেন—আগুনের মধ্যে দহনশক্তি সৃষ্টিকারী তার জন্য কুদরতের সাধারণ নিয়ম এটাই রেখেছেন যে, যে-বস্তুই আগুনের সঙ্গে মিশবে, আগুন সেটাকে দগ্ধ করে দেবে। কিন্তু বিবেক ও বুদ্ধির দিক থেকে এটা অসম্ভব নয় যে, সৃষ্টিকর্তা কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য আগুনের এই স্বভাবকে কোনো বিশেষ অবস্থায় দূর করে দেন এবং তা তাঁর কুদরতি নিয়মের বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ অভ্যাস বলে গণ্য হয়।

কিন্তু যে-ব্যক্তি এই মূল বিষয়কেই স্বীকার করে না বা মেনে নেয় না এবং প্রতিটি বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবকে ওই বস্তুর সত্তাগত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য বলে মানে—অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই এবং কোনো সময়েই বস্তুর স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য ওই বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক হওয়া সম্ভব নয়, সেই ব্যক্তির কথা ভিন্ন। এই ব্যক্তির সঙ্গে প্রথমে একটি বিষয় চূড়ান্ত করে নিতে হবে। বিবেক ও বুদ্ধি কি এটা বিশ্বাস করতে পারে যে, যে-বস্তু তার অস্তিত্বের ক্ষেত্রেই অপরের মুখাপেক্ষী তার কোনো বৈশিষ্ট্য বা গুণ কি সত্তাগত হতে পারে বা অবিচ্ছিন্ন থাকতে পারে?
গতবছর লন্ডন ও আমেরিকায় খোদাবখশ কাশ্মিরি প্রজ্জ্বলিত আগুনের ভেতর দিয়ে হাঁটার বিষয়টি এভাবে দেখালেন যে তিনি নিজেও জ্বলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলেন এবং আরো কয়েকজন ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গে আগুনের ভেতর দিয়ে হাঁটিয়ে নিলেন। এরপর সমস্ত বিজ্ঞানী খোদাবখশ কাশ্মিরির শরীর নানাভাবে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে জানতে চাইলেন যে, হয়তো তাঁর দেহ ফায়ারপ্রুফ বা অগ্নিনিরোধক, তাই আগুন তার দেহে কোনো ক্রিয়া করতে পারে নি। কিন্তু তাঁদের এই পরীক্ষা নিষ্ফল হলো। তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, খোদাবখশ কাশ্মিরি এবং অন্য যাঁরা তাঁর সঙ্গে আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন তাঁদের দেহ সাধারণ মানুষের দেহের চেয়ে কোনো অতিরিক্ত বস্তু বা বিশেষ অবস্থার অধিকারী নয়। অবশেষে তাঁদের অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করতে হলো তাঁরা এর তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম। এটা কীভাবে

সম্ভব যে আগুন বিদ্যমান, কিন্তু তা জ্বালিয়ে দিচ্ছে না?[৬৪] সুতরাং, যে-ব্যক্তি বস্তুর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যকে ওই বস্তুর সত্তাগত নিজস্ব স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য বলে বিশ্বাস করেন, এ-ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁর কাছে কী জবাব আছে?

অতএব, প্রভূত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যখন আমাদের অক্ষমতার অবস্থা এ-রকমই, তখন কি আমাদের জন্য এটা শোভনীয় যে আমরা ইলমে একিন (ওহি)-এর বর্ণিত প্রকৃত সত্য অস্বীকার করি, কেবল এ-কারণে যে, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি সাধারণ অবস্থাবলির পরিপ্রেক্ষিতে কারণ ব্যতীত কোনো পরিণতি বা ফল দেখতে অভ্যস্ত নয়?

যাইহোক, এমন ব্যক্তিকে প্রথমে আল্লাহ তাআলা ও তাঁরা গুণাবলি, বিশেষভাবে তাঁর কুদরত নামক গুণটির ব্যাপারে আলোচনা করা আবশ্যক। তারপর মুজিযা বিষয়ে আলোচনার সময় আসতে পারে। কিন্তু সেই আলোচনার জায়গা এটা নয়; বরং আকায়িদ শাস্ত্র।

আল্লাহর উটনী

মোটকথা, হযরত সালেহ আ. সামুদ সম্প্রদায়কে বার বার বুঝাতে থাকলেন, নসিহত করতে থাকলেন; কিন্তু তাঁর নসিহত তাঁর সম্প্রদায়ের ওপর কোনো ক্রিয়াই করলো না। বরং তাদের শত্রুতা ও বিরোধিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকলো। তারা কোনোভাবেই মূর্তিপূজা থেকে বিরত হলো না। যদিও নগণ্য ও দুর্বল একটি দল ঈমান আনলো এবং মুসলমান হলো, কিন্তু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আগের মতোই মূর্তিপূজার ওপরই অটল থাকলো। তারা আল্লাহর দেয়া যাবতীয় সচ্ছলতা ও সুখশান্তির কৃতজ্ঞতা করার পরিবর্তে নেয়ামত ও অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নিলো। তারা হযরত সালেহ আ.-কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলতো, হে সালেহ, যদি আমরা বাতিল উপাস্যদের পূজারী হতাম, আল্লাহ তাআলার সত্য ধর্মকে অস্বীকার করতাম এবং তাঁর পছন্দনীয় ও প্রিয় পন্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত না হতাম, তাহলে আজ আমাদের এই বিত্তবৈভব, সবুজ-শ্যামল ও সজীব উদ্যানসমূহ, সোনা-রুপার প্রাচুর্য, সুউচ্চ জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকাসমূহে

---

[৬৪] লন্ডন টাইমস।

বসবাস, নানা ধরনের সুস্বাদু ফলরাশির আধিক্য, মিঠাপানির চমৎকার নদী এবং উত্তম চারণভূমির প্রাচুর্য ইত্যাদি পেতাম না। তুমি তোমার নিজেকে এবং তোমার অনুসারীবৃন্দকে দেখো এবং তাদের সঙ্কটময় ও দারিদ্র্যপূর্ণ অবস্থার প্রতি লক্ষ করো এবং বলো, আল্লাহর কাছে প্রিয়ভাজন ও গ্রহণযোগ্য কারা—তোমরা না-কি আমরা?

হযরত সালেহ আ. বলতেন, তোমরা তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দময় জীবনযাপনের সাজসরঞ্জামের জন্য গর্ব করো না। আল্লাহ তাআলার সত্য রাসুল এবং তাঁর সত্য ধর্মকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না। যদি তোমাদের গর্ব, অহংকার, ঔদ্ধত্য ও বিরোধিত এ-অবস্থাতেই থাকে, তাহলে নিমিষের মধ্যে তোমাদের এ-সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর তোমরা নিজেরাও থাকবে না এবং তোমাদের বিলাস-সামগ্রীও থাকবে না। নিঃসন্দেহে এর সবকিছুই আল্লাহর নেয়ামত। কিন্তু বিষয় হলো এই, এসব নেয়ামত ভোগকারী আল্লাহর শোকর আদায় করবে এবং তাঁর সামনে ইবাদতে মাথা নত করবে। আবার এগুলোই নিসঃসন্দেহে আযাব ও লানতের সামগ্রী—যদি সেগুলোকে গর্ব ও দম্ভের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং, এমন মনে করা নিতান্ত ভুল যে, আনন্দ ও সুখময় জীবনযাপনের প্রতিটি সামগ্রী আল্লাহর সন্তুষ্ট থাকারই ফল।

সামুদ সম্প্রদায় এটা চিন্তা করে অস্থির ছিলো যে, আমাদের মধ্যকার একজন লোক আল্লাহর নবী হয় এবং সে আল্লাহর বিধি-বিধান শুনাতে শুরু করে—এটা কী করে সম্ভব! তাই তারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বলতো—

أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

'আমাদের মধ্য থেকে কি তার ওপরই কুরআন নাযিল হলো?' (আমরা বিদ্যমান থাকতেও কি এই লোকটি ওপর আল্লাহর নসিহতসমূহ নাযিল হলো?) [সুরা সাদ : আয়াত ৮]

অর্থাৎ, মানুষকেই যদি নবী হিসেবে প্রেরণ করা হতো, তাহলে এর যোগ্য ছিলাম আমরা, সালেহ নয়। আবার কোনো কোনো সময় তারা সম্প্রদায়ের যেসব দুর্বল লোক মুসলমান হয়েছিলেন তাঁদের লক্ষ করে বলতো—

أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ (سورة الأعراف)

'তোমরা কি জানো (বিশ্বাস করো) যে সালেহ তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত (রাসুল)?' [সুরা আ'রাফ : ৭৫]

قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (سورة الأعراف)

'তারা বললো, (মুসলমানগণ তখন বলতেন) তাঁর প্রতি যে-বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাসী।' (তাঁর প্রতি যে-পয়গাম নাযিল হয়েছে নিঃসন্দেহে আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি।) [সুরা আ'রাফ : ৭৫]

মুসলমানদের এই জবাব শুনে সেই দাম্ভিক মাতবরেরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতো এবং বলতো—

إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (سورة الأعراف)

'তোমরা যা বিশ্বাস করো আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।' (তোমরা যেসব বিষয়ে ঈমান এনেছো আমরা সেসব বিষয়কে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করি।) [সুরা আ'রাফ : ৭৬]

যাইহোক, হযরত সালেহ আ.-এর দাম্ভিক ও অবাধ্যাচারী সম্প্রদায় তাঁর নবীসুলভ আহ্বান ও উপদেশকে এমনি এমনি মেনে নিতে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর নিদর্শনের (মুজিযার) দাবি জানালো। তখন হযরত সালেহ আ. আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। তাঁর দোয়া কবুল হওয়ার পর তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, তোমাদের দাবিকৃত নিদর্শন (মুজিযা) উটনীর আকারে এই যে উপস্থিত আছে দেখো। দেখো, যদি তোমরা এই উটনীকে কোনো ধরনের কষ্ট দাও, তাহলে এই উটনীই তোমাদের ধ্বংসের নিদর্শন বলে সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও উটনীর মধ্যে কূপের পানি পানের পালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন; একদিন তোমাদের জন্য, আর একদিন উটনীর জন্য। সুতরাং, এর মধ্যে যেনো ব্যতিক্রম না হয়।

কুরআন মাজিদ এটিকে نَاقَةُ اللهِ (আল্লাহর উটনী) বলে আখ্যায়িত করেছে। যাতে তাদের লক্ষ থাকে যে, এমনি তো যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহর মালিকানাধীন, কিন্তু সামুদ সম্প্রদায় যেহেতু এটাকে আল্লাহর একটি নিদর্শনের আকারে দাবি করেছে, তাই এর বর্তমান বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা এটাকে নাকাতুল্লাহ বা আল্লাহর উটনী নামে ভূষিত করেছে।

[এ-প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদ থেকে কেবল দুটি বিষয় প্রমাণিত হয় : একটি হলো, সামুদ সম্প্রদায় হযরত সালেহ আ.-এর কাছে একটি নিদর্শন (মুজিযা) চেয়েছিলো এবং হযরত সালেহ আ. উটনীকে নিদর্শনরূপে পেশ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, হযরত সালেহ আ. তাঁর সম্প্রদায়কে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেনো উটনীর কোনো ক্ষতি না করে এবং তাদের ও উটনীর মধ্যে পানি পানের পালা নির্ধারণ করে নেয় এভাবে যে তাদের একদিন আর উটনীর একদিন। আর যদি তারা উটনীর কোনো ক্ষতি করে তাহলে এই উটনীই তাদের সম্প্রদায়ের ধ্বংসের নিদর্শন হবে। কিন্তু তারা উটনীটিকে হত্যা করলো, ফলে আল্লাহ তাআলার আযাবে তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়ে গেলো।

এই ঘটনা সম্পর্কে এর চেয়ে অতিরিক্ত যা-কিছু বর্ণিত হয়েছে তার ভিত্তি ওইসব হাদিসের রেওয়ায়েতের ওপর যেগুলো খবরে ওয়াহেদ হিসেবে বিবেচিত, অথবা বাইবেলের বর্ণনা বা প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনার ওপর। খবরে ওয়াহেদগুলো থেকে যে-বিবরণ পাওয়া যায়, মুহাদ্দিসগণের মতে তার কোনো কোনোটি সহিহ হাদিস, আর কোনো কোনোটি দুর্বল হাদিস। এ-কারণে হাফিয ইমামুদ্দিন বিন কাসির সুরা আ'রাফের তাফসিরে নাকাতুল্লাহ বা আল্লাহর উটনীর অস্তিত্বপ্রাপ্তি সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলোকে হাদিস বর্ণনার সনদের ভিত্তিতে উদ্ধৃত করেন নি; বরং ঐতিহাসিক ঘটনারূপে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই—সামুদ সম্প্রদায় হযরত সালেহ আ.-এর ধর্মপ্রচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকের সামনে হযরত সালেহ আ.-এর কাছে দাবি করলো যে, হে সালেহ, যদি তুমি সত্যসত্যই আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হও, তাহলে আমাদের কোনো নিদর্শন দেখাও, যাতে আমরা তোমার সত্যতা বিশ্বাস করতে পারি। হযরত সালেহ আ. তখন বললেন, এমন যেনো না হয় সেই নিদর্শন আসার ওপর তোমরা অবিশ্বাসের ওপরই বাড়াবাড়ি আর অবাধ্যাচরণ করতে থাকো। সম্প্রদায়ের সেই নেতারা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলো যে, নিদর্শন এলে আমরা তৎক্ষণাত ঈমান আনবো। হযরত সালেহ আ. তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী ধরনের নিদর্শন চাও। তারা দাবি করলো—সামনের পাহাড় থেকে অথবা আমাদের বসতির এই পাথরটি থেকে, যা পাশেই রয়েছে, একটি একটি উটনী বের

করে দেখাও। উটনীটি হবে গর্ভবতী এবং তৎক্ষণাৎ সে বাচ্চা প্রসব করবে। হযরত সালেহ আ. আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সামানের পাহাড়টি থেকে অথবা পার্শ্ববর্তী নির্দিষ্ট পাথরটি থেকে একটি গর্ভবতী উটনী প্রকাশিত হলো এবং তৎক্ষণাৎ বাচ্চা প্রসব করলো। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নেতৃবৃন্দের মধ্যে জুন্দা বিন আমর সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করলো এবং অন্য নেতারাও জুন্দার অনুসরণে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু তাদের প্রতিমাসমূহ ও মন্দিরগুলোর ঠাকুর যাওয়ার বিন আমর ও জুনাব এবং তাদের গণক রুবাব বিন সিফর ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী নেতাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখলো। এভাবে তারা অন্য সবাইকেও ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বারণ করলো।

তখন হযরত সালেহ আ. তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সতর্ক করে বললেন, দেখো, তোমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই এই নিদর্শন পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলার ফয়সালা এই যে, কূপের পানি পান করার জন্য পালা নির্ধারিত হবে। একদিন ওই উটনীর আর একদিন তোমাদের এবং তোমাদের যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তুর। কিন্তু সাবধান! ওই উটনী যেনো কোনো কষ্ট না পায়। যদি ওই উটনীকে কোনো কষ্ট দেয়া হয়, তবে তোমাদেরও কোনো কল্যাণ নেই।

হযরত সালেহ আ.-এর সম্প্রদায় এই বিস্ময়কর মুজিযা দেখে ঈমান না আনলেও তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকলো। কারণ তারা মনে মনে ওই উটনীটিকে আল্লাহর মুজিযা বলে স্বীকার করে নিয়েছিলো। তারপর এই নিয়মই চালু থাকলো যে, উটনীটির একদিন পানি পান করার পালা থাকতো এবং ওইদিন সম্প্রদায়ের সব মানুষ উটনীর দুধ থেকে উপকৃত হতো। দ্বিতীয় দিনে কওমের মানুষদের পালা থাকতো। ওই উটনীটি ও তার বাচ্চা নির্বিঘ্নে চারণভূমিগুলোতে চরে বেড়াতো এবং পরিতৃপ্তি লাভ করতো। কিন্তু ধীরে ধীরে এটাও তাদের মধ্যে বেঁধে যেতে লাগলো। তাদের পরস্পরের মধ্যে শলা-পরামর্শ চলতে লাগলো যে, ওই উটনীটিকে খতম করে দেয়া হোক। তাহলে পানি পানের পালার কাহিনির অবসান ঘটবে এবং আমরা ঝামেলামুক্ত হতে পারবো। কারণ আমাদের জন্তু-জানোয়ারগুলোর জন্য এবং আমাদের নিজেদের জন্য পালার শর্তটি নিতান্ত অসহনীয়। এই ধরনের শলা-পরামর্শ ও কথাবার্তা

চললেও কেউ-ই উটনীটিকে হত্যা করার সাহস পাচ্ছিলো না। কিন্তু সাদুক নামের জনৈকা রূপসী ও ধনবতী নারী নিজেকে মাসদা (مصدع) নামের এক পুরুষের সামনে আর উনাইযা নামের এক ধনবতী নারী তার নিজের এক অতি সুন্দরী কন্যাকে কিদার (قدار) নামের এক যুবকের সামনে পরিবেশন করে বললো, যদি তোমরা দুজনে মিলে ওই উটনীটিকে হত্যা করতে পারো তাহলে এই দুই নারীকে তোমাদের আয়ত্তাধীন দিয়ে দেয়া হবে। তোমরা তাদেরকে বিয়ে করে সুখ-সম্ভোগ করবে।

অবশেষে কিদার ও মাসদাকে উটনীটিকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করে নেয়া হলো এবং সিদ্ধান্ত হলো যে, তারা পথে ওত পেতে বসে থাকবে এবং উটনীটি চারণভূমির দিকে গমনকালে ওরা আক্রমণ করবে। অন্য কয়েকজন লোকও তাদের সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলো।

সারকথা, যেমন পরামর্শ, তেমনি কাজ করা হলো। চক্রান্ত করে তারা উটনীটিকে হত্যা করে ফেললো। এরপর তারা পরস্পর শপথ করলো যে, রাত হলে আমরা সবাই মিলে সালেহ ও তার পরিবারের সব সদস্যকে হত্যা করে ফেলবো। পরে কসম খেয়ে তার বন্ধুদেরকে বিশ্বাস করাবো যে, এই কাজ আমাদের নয়।

উটনীর বাচ্চাটি মায়ের হত্যাকাণ্ড দেখে পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করলো এবং চিৎকার করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

হযরত সালেহ আ. উটনী হত্যার সংবাদ অবগত হয়ে অনুতাপ ও আফসোস করতে করতে তাঁর সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বললেন, অবশেষে তা-ই ঘটলো যার আশঙ্কা আমি করেছিলাম। এখন তোমার আল্লাহর আযাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকো। তিনদিন পর আল্লাহর আযাব তোমাদের বিনাশ ঘটাবে।

তিনদিন পর বিদ্যুতের চমক ও বজ্রনিনাদের শাস্তি এসে একরাতেই তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিলো। আর ভবিষ্যতে আগমনকারী মানুষের জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির শিক্ষা রেখে গেলো।

এই ঘটনাটির সঙ্গে হাফিয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির কয়েকটি হাদিসের রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন। যথা :

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজর নামক স্থানে পৌছলে সাহাবায়ের কেরাম রা. সামুদ সম্প্রদায়ের কূপ থেকে

পানি তুলে তা দিয়ে আটার খামিরা তৈরি করে রুটি বানাতে লাগলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সংবাদ জানতে পেরে পানি ফেলে দিতে এবং হাড়ি-পাতিল উল্টে দিয়ে আটাগুলো নষ্ট করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, এই সেই জনপদ, যেখানে আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিলো। তোমরা এখানে অবস্থান করো না এবং এখানকার কোনো বস্তু কাজে লাগিও না। তোমরা সামনে এগিয়ে গিয়ে শিবির স্থাপন করো। এমন না হয় যে, তোমরাও কোনো বিপদে আক্রান্ত হয়ে পড়ো।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা হিজরের এই বসতিগুলোতে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভীতি সঞ্চার করে অক্ষমতা ও বিনয়ের সঙ্গে রোদন করতে করতে প্রবেশ করো। অন্যথায় এসব বসতিতে প্রবেশই করো না। পাছে এমন না হয় যে তোমরাও নিজেদের অসতর্কতার কারণে আযাবের বিপদে আক্রান্ত হয়ে যাও।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজর নামক স্থানে প্রবেশ করে বললেন, আল্লাহ তাআলার কাছে নিদর্শন চেয়ো না। দেখো, হযরত সালেহ আ.-এর সম্প্রদায় নিদর্শন দাবি করেছিলো। নিদর্শনরূপে একটি উটনী প্রকাশিত হয়েছিলো। উটনীটি এখানে পাহাড়ের গুহা থেকে বের হয়ে নিজের পালার দিন পানাহার করে ওখানেই চলে যেতো। যেদিন তার পালা থাকতো, সেদিন সে সামুদ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নিজের দুধ দ্বারা প্ররিতৃপ্ত করতো। কিন্তু সামুদ সম্প্রদায় অবশেষে অবাধ্যাচরণ করলো এবং উটনীটির পায়ের গোছা কেটে দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেললো। তার ফল এই দাঁড়ালো যে, আল্লাহ তাদের ওপর বিকট ধ্বনির শাস্তি চাপিয়ে দিলেন। এই শাস্তির ফলে তারা নিজ নিজ ঘরেই মরে পড়ে থাকলো। কেবল আবু রিগাল নামের এক ব্যক্তি বেঁচে থাকলো। সে হারাম শরিফে গিয়েছিলো। কিন্তু যখনই সে হারামের সীমানা থেকে বাইরে বের হলো, সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির শিকারে পরিণত হলো।

হাফিয ইবনে কাসির এই হাদিস তিনটিকে মুসনাদে আহমদ থেকে সনদের সঙ্গে উদ্ধৃত করে এগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলেছেন। [তারিখে ইবনে কাসির, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৮-১৩৯]

এই বিস্তারিত বিবরণের সারমর্ম এই কুরআন মাজিদ থেকে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো যে, ناقة الله (আল্লাহর উটনী) আল্লাহ তাআলার একটি নিদর্শন ছিলো এবং তা নিজের মধ্যে অবশ্যই এমনকিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করতো যার কারণে তাকে এমন নিদর্শন বলা হয়েছে, কুরআন মাজিদে গুরুত্বের সঙ্গে যার উল্লেখ রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে— هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً 'এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শন।'[৬৫] এরপর আল্লাহ তাআলা উটনী ও সামুদ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেভাবে পানি করার পালা বণ্টন করে দিলেন তা নিজেই এ-বিষয়ের একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ যে, এই উটনী নিজের মধ্যে এমন বিশেষত্ব ধারণ করতো যা আল্লাহর নিদর্শন নামে আখ্যায়িত হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু কথা এই যে, এই উটনীর অস্তিত্ব কীভাবে হলো এবং কী কারণে তা আল্লাহর নিদর্শন ও নবীর মুজিযা হলো, কুরআন মাজিদে তা উল্লেখ করা হয় নি। অবশ্য বিভিন্ন সহিহ খবরে ওয়াহেদ-এর মাধ্যমে এ-বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে। এর বিবরণ তারিখে ইবনে কাসির থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ ওখানেও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় নি। বরং তাফসিরের কিতাবসমূহে ইসরাইলি রেওয়াতে থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে অথবা হাদিসের দুর্বল রেওয়ায়েত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সঙ্গত এটাই যে, ঘটনাটির মোটামুটি বিবরণ ও বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখা হবে। ঘটনার যে-পরিমাণ কুরআন মাজিদ স্পষ্ট বর্ণনা করেছে, কোনো প্রকার ব্যাখ্যার না করে তার প্রতি বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। আর ঘটনার যে-পরিমাণ সহিহ হাদিসের বর্ণনা থেকে (সেই হাদিস খবরে ওয়াহেদ-এর পর্যায়ভুক্ত হলেও) জানা যায়, অর্থাৎ উপরিউক্ত মোটামুটি বিবরণের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় তা সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তারিত বিবরণ হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্য। যদিও তা কুরআন মাজিদের বর্ণনার স্তরে পৌঁছতে পারে না। এর চেয়ে অধিক অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণের মর্যাদা তা-ই, যা সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা ও ইসরাইলি রেওয়াতেসমূহের মর্যাদা।]

---

[৬৫] সুরা আ'রাফ : আয়াত ৭৩।

আর উটনীটিকে لَكُمْ آيَةً অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য নিদর্শন' হিসেবে আখ্যায়িত করে এটাও বলে দেয়া হলো যে, এই নিদর্শনটি নিজের মধ্যে বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন করছে। কিন্তু দুর্ভাগা সামুদ সম্প্রদায় বেশি সময় উটনীটিকে সহ্য করতে পারলো না। একদিন তারা চক্রান্ত করে কিদার বিন সালেফকে এ-ব্যাপারে প্রস্তুত করে ফেললো। সে প্রথমে উটনীটির ওপর আক্রমণ করবে আর অন্য লোকেরা তাকে সহযোগিতা করবে। এভাবে তারা উটনীটিকে হত্যা করে ফেললো। হযরত সালেহ আ. এই দুঃসংবাদ জানতে পেরে অশ্রুভরা চোখে তাঁর সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন, হে দুর্ভাগা কওম, শেষ পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধরতে পারলে না। এখন আল্লাহর শাস্তির অপেক্ষায় থাকো। তিনদিন পর সেই অবধারিত শাস্তি আসবে এবং তোমাদের সবাইকে চিরকালের জন্য ধ্বংস করে দেবে।

সাইয়িদ আবুস সানা শিহাবুদ্দিন আল-আলুসি তাঁর তাফসির রুহুল মাআনিতে লিখেছেন, সামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তি আসার লক্ষণ আগের দিন ভোরবেলা থেকেই শুরু হয়ে গেলো। প্রথম দিন তাদের সবার চেহারা এমন ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করলো, কোনো ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তির প্রাথমিক অবস্থা যেমন হয়ে থাকে। দ্বিতীয় দিন তাদের সবার চেহারা লাল হয়ে যায়, যেনো তা ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থা। তৃতীয় দিন তাদের চেহারা কালো বর্ণের (কালিমাচ্ছন্ন) হয়ে পড়লো। এটা ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তির তৃতীয় স্তর, যার পরে কেবল মৃত্যুর স্তর অবশিষ্ট থাকে। তিনদিন পর্যন্ত আযাবের এই আলামতসমূহ যদিও তাদের চেহারাকে ফ্যাকাশে, লাল ও কালো বর্ণের বানিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু এই বর্ণগুলোর পর্যায়ক্রমিক বৈশিষ্ট্য পরিষ্কারভাবে এটা ব্যক্ত করছে যে, তারা মনে মনে হরযত সালেহ আ.-কে নবী বলে বিশ্বাস করতো, কেবল বিদ্বেষ ও শত্রুতাবশত তা অস্বীকার করতো। এখন যেহেতু তারা আল্লাহর আদেশের বিপরীত অপরাধ করে ফেলেছে এবং তার বিনিময়ে হযরত সালেহ আ.-এর মুখে ভয়াবহ শাস্তির সংবাদ শুনেছে, তাই তাদের চেহারায় ভয়ের স্বভাবগত বর্ণ ও চিত্র প্রকাশ পেতে লাগলো। যা মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ার সময় ভীতসন্ত্রস্ত অপরাধী ও পাপাচারী ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

যাইহোক, সেই তিনদিন পর প্রতিশ্রুত সময় এসে গেলো এবং রাতের বেলা এক বিকট ভয়ঙ্কর ধ্বনি এসে প্রত্যেকে যে-অবস্থায় তারা ছিলো সে অবস্থাতেই ধ্বংস করে দিলো। কুরআন মাজিদ এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক আওয়াজকে কোথাও 'সায়িকাহ' বা বজ্রনিনাদঅলা বিদ্যুৎ, কোথাও 'রাজফাহ' বা ভূকম্পন সৃষ্টিকারী বস্তু, কখনো 'তাগিয়াহ' অর্থাৎ ভয়ঙ্কর নিনাদ আবার কখনো 'সাইহাহ' বা চিৎকার নামে আখ্যায়িত করেছে। কারণ এই নামগুলো একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকার বিশেষণের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে। যাতে মানুষ বুঝতে পারে আল্লাহ তাআলার সেই শাস্তির ভয়াবহতা কেমন বিভিন্ন প্রকারের ছিলো। তোমরা এমন একটি তাপ-উজ্জ্বল বিদ্যুতের কল্পনা করো যা বার বার কম্পনের সঙ্গে চলকে ওঠে, বজ্রপাত করে ও গর্জন করে। আর একইভাবে আবারো চলকে ওঠে, কখনো পূর্ব দিকে, আবার কখনো পশ্চিম দিকে। আর যখন বজ্রবিদ্যুৎ এইসব অবস্থার সঙ্গে বার বার চমকাতে, গর্জন করতে ও কম্পন করতে করতে এক ভয়াবহ ধ্বনির সঙ্গে কোনো স্থানে পতিত হয়, তখন সেই স্থান ও আশপাশের স্থানসমূহের অবস্থা কেমন হয়? এটা সেই শাস্তির তুলনায় একটি সাধারণ অনুমানমাত্র, যে-শাস্তি সামুদ সম্প্রদায়ের ওপর পতিত হয়েছিলো। সেই শাস্তি তাদেরকে ও তাদের বসতিসমূহকে ধ্বংস ও বরবাদ করে অবাধ্যাচারীদের অবাধ্যতা আর অহংকারীদের অহংকারের পরিণাম প্রকাশ করার জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটি শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত রেখে গেছে।

একদিকে সামুদ সম্প্রদায়ের ওপর এই শাস্তি পতিত হলো আর অপরদিকে হযরত সালেহ আ. ও তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে ওই শাস্তি থেকে সুরক্ষিত রাখলেন।

হযরত সালেহ আ. দুঃখভারাক্রান্ত মন ও বিষণ্ন চেহারা নিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন—

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (سورة الأعراف)

'হে আমার সম্প্রদায়, আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো হিতোপদেশ দানকারীদেরকে পছন্দ করো না।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ৭৯]

ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের উদ্দেশে হযরত সালেহ আ.-এর এই সম্বোধন ওই ধরনের সম্বোধন ছিলো, যেমন ছিলো বদরের যুদ্ধে মুশরিক সরদারদের ধ্বংস হওয়ার পর লাশগুলোর গর্তের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্বোধন। তিনি মৃতদেহগুলোর উদ্দেশে তাদের নাম ধরে বলেছিলেন—

يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا

'হে অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুকের পুত্র অমুক, তোমাদের আল্লাহর এবং তার রাসুলের আনুগত্য পছন্দ হয়েছিলো? আমাদের প্রতিপালক আমাদের সঙ্গে যা-কিছুর ওয়াদা করেছিলেন, নিঃসন্দেহে অবশ্যই আমরা তা পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সঙ্গে যা-কিছুর ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা সত্যসত্য পেয়েছো?'[৬৬]

এ-জাতীয় সম্বোধন সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে দুই ধরনের মতামত রয়েছে :

এক.

এ-জাতীয় সম্বোধন আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আল্লাহ তাআলা তাঁদের এসব কথা মৃত ব্যক্তিদের কানে অবশ্যই পৌঁছে দিয়ে থাকবেন। যদিও মৃত ব্যক্তিরা জবাব প্রদানে অক্ষমই থাকে। কারণ, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের মৃতদেহগুলোর উদ্দেশে এভাবে সম্বোধন করলেন, তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কি শুনছে?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের চেয়ে অধিক শুনছে; কিন্তু জবাব দিতে অক্ষম।'

---

[৬৬] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৩৯৭৬।

দুই.

এই ধরনের সম্বোধন মনে দুঃখ-যন্ত্রণা প্রকাশ করার জন্য হয়ে থাকে। যেমন মনে করুন, আপনি কোনো ব্যক্তিকে সতর্ক করে বলেছিলেন, এই বাগানে প্রবেশ করো না, তাতে প্রচুর সাপ আছে। তোমার দংশিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু সেই ব্যক্তি আপনার কথা অমান্য করে বাগানে প্রবেশ করলো এবং সাপে দংশিত হয়ে মারা গেলো। তখন আপনি তার মৃতদেহের কাছে গেলেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবেই হঠাৎ বলে উঠলেন, আফসোস, আমি কি তোমাকে বলেছিলাম না যে বাগানে প্রবেশ করো না। তা না হলে সাপে কাটার আশঙ্কা আছে। অবশেষে তা-ই হলো।

তিন.

এ-জাতীয় সম্বোধনের সম্বোধিত ব্যক্তি আসলে সেই জীবিত মানুষেরাই হয়ে থাকে যারা মৃতদেহগুলোকে দেখছে। যাতে তারা উপদেশ লাভ করে এবং এ-ধরনের অবাধ্যাচরণ করতে সাহস না পায়।

সম্প্রদায়ের ধ্বংস প্রাপ্তি এবং হযরত সালেহ আ.-এর অবস্থান

এটা একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন যে, সামুদ সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর হযরত সালেহ আ. ও তাঁর অনুগামী ঈমানদার মানুষগণ কোথায় বসতি স্থাপন করলেন? নিশ্চিত ও নির্দিষ্টরূপে এই জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করা প্রায় অসম্ভব। অবশ্য প্রবল ধারণা এই যে, তারা কওমের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর ফিলিস্তিন অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। কারণ, হিজর-এর নিকটবর্তী এ-স্থানটিই হিজর-এর মতো ছিলো, যা সবুজ ও সজীব ছিলো এবং গৃহপালিত পশুদের দানা-পানির জন্য উত্তম ছিলো। আর ফিলিস্তিন অঞ্চলে এ-স্থানটি সম্ভবত রামাল্লাহ হবে বা অন্যকোনো স্থান হবে। মুফাস্‌সিরগণ এই জিজ্ঞাসার জবাবে কয়েকটি মত পোষণ করেন :

১। সালেহ আ. ও তাঁর অনুসারীরা রামাল্লাহ নামক স্থানের কাছে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাফসির ইবনে খাযিনে এমনই উল্লেখ করা হয়েছে।

২। হাযরামাউতে গিয়ে বসবাস করেন। কেননা, ওটাই তাদের আদি ও আসল আবাসস্থল ছিলো। কারণ তা আহকাফেরই একটি অংশ। ওখানে একটি সমাধি আছে, যা হযরত সালেহ আ.-এর সমাধি বলে প্রসিদ্ধ।

৩। সামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর তাঁরা সেই বসতিতেই বসবাস করতে থাকেন। এটা সাধারণ ঐতিহাসিকদের মত।
৪। কওমে সামুদের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর তাঁরা মক্কা মুকাররমায় চলে আসেন এবং ওখানেই বসবাস করতে শুরু করেন। এখানে তাঁরা ইন্তেকালও করেন। কা'বা গৃহের পশ্চিম দিকে হারাম শরিফের মধ্যেই তাঁর কবর অবস্থিত। সাইয়িদ আলুসি তাঁর তাফসিরগ্রন্থে একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, হযরত সালেহ আ.-এর ওপর ঈমান আনয়নকারী মুসলমানগণ, যাঁরা তাঁর সঙ্গে শাস্তি থেকে রক্ষিত ছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিলো একশো বিশজন। আর ধ্বংসপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিলো প্রায় দেড় হাজার পরিবার।

এসব বিপরীতমুখী আলোচনার পর এখন এই ঘটনা সম্পর্কে কুরআনের আয়াতগুলো পাঠ করুন। আয়াতগুলো বর্ণিত ঘটনাসমূহের প্রকৃত উৎস এবং উপদেশ ও নসিহতের অনুপম উপকরণ সরবরাহ করছে :

এক.

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ () وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ () قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ () قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ () فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ () فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ () فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (سورة الأعراف)

'আর (এভাবে আমি) সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম তাদের ভাই সালেহকে। সে বলেছিলো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্যকোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্যে একটি (চরম মীমাংসাকারী) নিদর্শন। সুতরাং, একে আল্লাহর জমিনে চরে খেতে দাও এবং একে কোনো কষ্ট দিয়ো না, দিলে (তার প্রতিফলস্বরূপ) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদের ওপর আপতিত হবে। তোমরা স্মরণ করো, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো। (এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।) সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।" তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা (যাদের ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্যের অহংকার ছিলো) সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার—যাদেরকে (দরিদ্রতা ও নিরাশ্রয়তার কারণে) দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে বললো, "তোমরা কি জানো যে (সত্যিকার অর্থেই জেনে নিয়েছো যে) সালেহ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত?" (অর্থাৎ, আমরা তার মধ্যে এমন কোনো বিষয় দেখতে পাচ্ছি না।) তারা বললো, "তাঁর প্রতি যে-বাণী অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তার প্রতি বিশ্বাসী।" দাম্ভিকেরা বললো, "তোমরা যা বিশ্বাস করো আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।" তারপর তারা সেই উষ্ট্রীকে হত্যা করে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং বলে, "হে সালেহ, তুমি রাসুল হয়ে থাকলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে আসো।" এরপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাদের সকাল হলো নিজেদের গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায় (মৃত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো)। তারপর সে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং (মৃতদেহগুলোকে লক্ষ করে) বললো, "হে আমার সম্প্রদায়, আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিয়েছিলাম; কিন্তু (আফসোস) তোমরা তো হিতোপদেশ দানকারীদেরকে পছন্দ করো না।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ৭৩-৭৯]

দুই.

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ () قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ () قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ () وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ () فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ () فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ () وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ () كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ (سورة هود)

'আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই (তাদের ভাই-বেরাদরের মধ্য থেকে) সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে (তাদের কাছে গিয়ে) বলেছিলো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমার অন্যকোনো ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করো। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক (সবার) নিকটে (রয়েছেন), (এবং) তিনি (সবার) আহ্বানে সাড়া দেন।" তারা বললো, "হে সালেহ, এর আগে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল (তোমার সঙ্গে আমাদের আশা-ভরসার সম্পর্ক ছিলো)। তুমি কি আমাদের নিষেধ করছো ইবাদত করতে তাদের, যাদের ইবাদত করতো আমাদের পিতৃপুরুষেরা? (এটা কেমন কথা?) আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি সে বিষয়ে, যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করছো।" (আমাদের অন্তরে প্রত্যয় জাগছে না।) সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন,

তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে (আল্লাহর শাস্তির মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য করবে) আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি (তাঁর হুকুমের নাফরমানি করি)? সুতরাং তোমরা (নিজেদের বাসনানুরূপ কর্মের প্রতি আহ্বান করে) তো কেবল আমার ক্ষতি বৃদ্ধি করছো (আল্লাহর দীন প্রচারে বাধা প্রদান করে কোনো উপকার করছো না; বরং ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছো)। হে আমার সম্প্রদায়, এটা আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্য (মীমাংসাকারী) নিদর্শনস্বরূপ। একে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে দাও। একে কোনো কষ্ট দিয়ো না। কষ্ট দিলে আশু (তৎক্ষণাৎ) শাস্তি তোমাদের ওপর পতিত হবে।" কিন্তু তারা (আরো বেশি হঠকারিতা করে) উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে ফেললো। এরপর সে বললো, "তোমরা তোমাদের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও। (এখন তোমাদের জন্য কেবল তিন দিনের অবকাশ।) ইহা একটি প্রতিশ্রুতি, যা মিথ্যা হবার নয়।" যখন আমার নির্দেশ এলো তখন আমি সালেহ ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিলো তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে। তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী। অতঃপর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিলো (কুফর ও জুলুম করেছিলো) মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো; ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে (মরে গিয়ে) নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেলো; (তারা এমনভাবে অকস্মাৎ মরে গিয়েছিলো) যেনো তারা ওখানে কখনো বসবাস করে নি। জেনে রাখো, সামুদ সম্প্রদায় তো তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিলো। জেনে রাখো, ধ্বংসই হলো সামুদ সম্প্রদায়ের পরিণাম। [সূরা হুদ : আয়াত ৬১-৬৮]

তিন.

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ () وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ () وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ () فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ () فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (سورة الحجر)

'স্মরণ করো, হিজরবাসীরা রাসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিলো; আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম (নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছিলাম), কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিলো। (সত্য থেকে মুখ

ফিরিয়ে থাকলো।) তারা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করতো নিরাপদ বসবাসের জন্য। (কিন্তু এই নিরাপদ থাকা তাদের কোনোই কাজে এলো না।) অতঃপর প্রাতকালে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো। (এবং সবাই নিজগৃহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।) সুতরাং তারা যা (চেষ্টা-তদবির করে) অর্জন করতো তা তাদের কোনো কাজে আসে নি। [সূরা হিজর : আয়াত ৮০-৮৪]

চার.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ () إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ () إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ () فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ () وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ () أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ () فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ () وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ () وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ () فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ () وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ () الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ () قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ () مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ () قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ () وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ () فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ () فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ () وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (سورة الشعراء)

'সামুদ সম্প্রদায় রাসুলগণকে অস্বীকার করেছিলো। যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললো, "তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসুল। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান (বা পারিশ্রমিক) চাই না, আমার পুরস্কার তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছেই আছে। তোমাদেরকে কি (ইহলোকের এসব বস্তুর মধ্যে) নিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে রাখা হবে, যা এখানে আছে তাতে— উদ্যানে, প্রস্রবণে ও শস্যক্ষেতে এবং সুকোমল গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগানে? তোমরা তো নৈপুণ্যের সঙ্গে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না; যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে

না।" তারা (নবীকে) বললো, "তুমি জাদুগ্রস্তদের অন্যতম। (তোমাকে কেউ জাদু করেছে।) তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ। কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে (নিজের নবুওতের) একটি নিদর্শন উপস্থিত করো।" সালেহ বললো, "এই একটি উষ্ট্রী, এর জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা; এবং এর কোনো ক্ষতি করো না; করলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদের ওপর পতিত হবে।" কিন্তু তারা উষ্ট্রীকে (পা কেটে ফেলে) বধ করলো, পরিণামে তারা অনুতপ্ত হলো। অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।' [সূরা শুআরা : আয়াত ১৪১-১৫৯]

পাঁচ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ () قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ () قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ () وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ () قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ () وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ () فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ () فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ () وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (سورة النمل)

'আমি অবশ্যই সামুদ সসম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম এই আদেশসহ : তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো। (দুই দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া করতে লাগলো।) সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেনো কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ তরান্বিত করতে চাচ্ছো? (তা তাড়াতাড়ি কামনা করছো।) কেনো তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছো না, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো?" তারা বললো, "তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অকল্যাণের কারণ মনে করি।"

(তোমরা অশুভ পদক্ষেপ গ্রহণ করছো।) সালেহ বললো, "তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহর ইখতিয়ারে, (তাঁর কাছেই রয়েছে) বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (আমাদেরকে যে অপবাদ দিচ্ছো তা ঠিক নয়।) আর সেই শহরে ছিলো এমন নয় ব্যক্তি,[৬৭] যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং সৎকাজ করতো না। তারা বললো, "তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করো—"আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করবো; তারপর তার অভিভাবককে (খুনের বদলা দাবিকারীদেরকে) নিশ্চয় বলবো, তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নি; (তারা কখন ধ্বংস হয়েছে তা আমরা দেখি নি।) আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।" তারা এক (গোপনীয়) চক্রান্ত করেছিলো এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম; কিন্তু তারা বুঝতে পারে নি। (টেরই পায় নি।) অতএব দেখো, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হয়েছে—আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সবাইকে ধ্বংস করেছি। এই তো তাদের ঘর-বাড়ি, সীমালঙ্ঘনের কারণে তা জনশূন্য (ও বিধ্বস্ত) অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। এবং যারা মুমিন ও মুত্তাকি ছিলো (আবাধ্যচরণ থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিলো) তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। [সুরা আন-নামল : আয়াত ৪৫-৫৩]

ছয়.

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ () وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (سورة حم السجدة)

'আর সামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম; কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিলো। (পথ দেখার চেয়ে অন্ধ থাকাকেই পছন্দ করলো।) অতঃপর তাদেরকে

---

[৬৭] رهط অর্থ দল। এখানে সে-শহরের নয়টি দলের নয়জন নেতার কথা বলা হচ্ছে, যারা ধনেজনে ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলো। তারা হযরত সালেহ আ.-কে তাঁর পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের এই ষড়যন্ত্র বিফল হয় এবং তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যায়।

লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ। আমি রক্ষা করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিলো এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করতো। (পাপকাজ থেকে আত্মরক্ষা করতো।) [সূরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ১৭-১৮]

সাত.

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ () فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ () فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (سورة الذاريات)

'আরো নিদর্শন রয়েছে সামুদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিলো ভোগ করে নাও কিছুকালের জন্য। কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো; ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো এবং তারা তা দেখছিলো। তারা উঠে দাঁড়াতে পারলো না এবং তার প্রতিরোধ করতেও পারলো না।' [সূরা আয-যারিয়াত : আয়াত ৪৩-৪৫]

আট.

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى () وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (سورة النجم)

'আর এই যে, তিনিই প্রাচীন আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন এবং সামুদ সম্প্রদায়কেও; (তাদের) কাউকে তিনি অবশিষ্ট রাখেন নি। [সূরা আন-নাজম : আয়াত ৫০-৫১]

নয়.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ () فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ () أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ () سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ () إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ () وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ () فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ () فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ () إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ () وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (سورة القمر)

'সামুদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে (রাসূলগণকে) অস্বীকার করেছিলো, তারা বলেছিলো, "আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করবো?

তবে তো আমরা পথভ্রষ্টতায় এবং উন্মত্ততায় পতিত হবো। আমাদের মধ্যে কি তার প্রতিই প্রত্যাদেশ হলো? (আমাদের মধ্যে এর উপযুক্ত আর কেউ কি নেই?) না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।" (নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করছে।) আগামীকাল (অতিসত্বরই) তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী, অতএব (হে নবী,) তুমি তাদের আচরণ লক্ষ করো (অপেক্ষা করো) এবং ধৈর্যশীল হও। এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে। অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করলো, সে ওটাকে (উষ্ট্রীটিকে) ধরে হত্যা করলো। কীরূপ কঠোর ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক (ভয়ঙ্কর) মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেলো খোয়াড় প্রস্তুতকারীর[৬৮] বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার মতো। আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; সুতরাং (চিন্তাশীল ও) উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?'
[সুরা আল-কামার : আয়াত ২৩-৩২]

দশ.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ () فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (سورة الحاقة)

'আদ ও সামুদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিলো মহাপ্রলয়। আর সামুদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় দ্বারা।
[সুরা আল-হাককাহ : আয়াত ৪-৫]

এগারো.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا () إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا () فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا () فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا () وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (سورة الشمس)

---

৬৮ هشيم-এর অর্থ শুকনো তৃণ ও শুকনো গাছের ডাল। তৃণাদি ও গাছের শুকনো খণ্ডকেও هشيم বলা হয়। المحتظر-এর অর্থ গৃহপালিত পশুর খোয়াড় নির্মাণকারী। আরববাসীরা শুকনো শাখা-পল্লব দ্বারা ছাগল- ভেড়ার খোয়াড় ও বেড়া নির্মাণ করে থাকে।

'সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করেছিলো (নবী ও নবীর মুজিযাকে)। (তাদের নবী হযরত সালেহ আ.-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিলো।) তাদের মধ্যে যে-সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন (উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার জন্য) তৎপর হয়ে উঠলো, তখন আল্লাহর রাসুল তাদেরকে বললো, "আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও।"[৬৯] কিন্তু তারা রাসুলকে অস্বীকার কলো এবং ওটাকে (উষ্ট্রীকে) কেটে ফেললো (পা কেটে দিলো)। তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন। এবং এর পরিণাম সম্পর্কে (বদলা নিতে) তিনি ভয় করেন না। [সূরা আশ-শামস : আয়াত ১১-১৫]

কয়েকটি শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত

এক.

নাকাতুল্লাহ বা আল্লাহর উটনী হযরত সালেহ আ.-এর মুজিযা অর্থাৎ তাঁর নবুওতের সত্যতার একটি নিদর্শন ছিলো। তারপরও কুরআন মাজিদ বলছে, তা সামুদ সম্প্রদায়ের জন্য পরীক্ষা ছিলো এবং পরিণামে তাদের ধ্বংসের নিদর্শন প্রমাণিত হলো। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

'আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী, অতএব তুমি তাদের আচরণ লক্ষ করো এবং ধৈর্যশীল হও।' [সূরা আল-কামার : আয়াত ২৭]

দুই.

আল্লাহ তাআলার এই রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, যদি তিনি কোনো সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে নবী প্রেরণ করেন এবং সেই সম্প্রদায় নবীর আহ্বান ও উপদেশের প্রতি কর্ণপাত না করে, তাহলে এটা জরুরি নয় যে সেই সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হবে। কিন্তু যে-সম্প্রদায় তাঁদের নবীর কাছে এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে মুজিযা দাবি করে যে, যদি তাদের কাঙ্ক্ষিত মুজিযা প্রকাশিত হয় তবে তারা অবশ্যই ঈমান আনবে, এরপর যদি তারা ঈমান না আনে, তাহলে

---

[৬৯] 'সাবধান হও' কথাটি এখানে উহ্য আছে।

তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করেন না। তবে যদি তারা তওবা করে এবং আল্লাহর দীনকে কবুল করে নেয় তাহলে ভিন্ন কথা। অন্যথায় তারা আল্লাহর আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে অন্য লোকদের জন্য শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হয়ে যায়।

তিন.

কিন্তু রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওত আল্লাহর এই রীতি ও নিয়মের বাইরে। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছি, তিনি যেনো আমার (বর্তমান ও ভবিষ্যতের) উম্মতদের ওপর ব্যাপক আযাব নাযিল না করেন। আর আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রার্থনা কবুল করেছেন কুরআন মাজিদে এই বলে—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

'আল্লাহ এমন নন যে, তুমি (অর্থাৎ মুহাম্মদ সা.) তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।' [সুরা আনফাল : আয়াত ৩৩]

চার.

এটা একটি মারাত্মক ভুল ও নফসের ধোঁকা যে, মানুষ সচ্ছল জীবিকা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাত্রা এবং পার্থিব সম্মান ও মর্যাদা দেখে ভাবে যে-সম্প্রদায় বা যে-ব্যক্তির কাছে এসব বস্তু বিদ্যমান, তারা অবশ্যই আল্লাহর আশ্রয়ে রয়েছে। তারা এটাও মনে করে, তাদের সচ্ছল ও সুখের জীবিকা এ-বিষয়ের নিদর্শন যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সম্মতি তাদের সঙ্গে রয়েছে।

এই ভাবনা ভুল ও আত্মপ্রবঞ্চনা একারণে যে, এই সামুদের কাহিনিতে জায়গায় জায়গায় এমন বর্ণনা আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি থেকে বেশি সচ্ছল জীবিকা, সমৃদ্ধি ও সুখশান্তি আযাব ও ধ্বংসের পূর্বাভাস বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সম্প্রদায়সমূহের জন্য তার সময়সীমা কয়েক মাস বা কয়েক বছর নয়; বরং ঘাবড়ে দেয়ার মতো দীর্ঘ সময়সীমা হোক না কেনো। কিন্তু সব ধরনের পার্থিব ও আনন্দময় জীবনের সঙ্গে যখন কুফর, আবাধ্যাচরণ ও অহংকার কোনো সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অভ্যাসে

পরিণত হয়, তখন মনে করতে হবে যে, সেই সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। মনে রাখতে হবে—

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

'তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।' [সূরা আল-বুরুজ : আয়াত ১২]

অবশ্য যদি এসব সুখ-সমৃদ্ধি ও আনন্দময় জীবনের সঙ্গে সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হয়, আল্লাহর বান্দাগণের সঙ্গে সদাচারী হয় এবং পরস্পর কল্যাণকর উদ্দেশ্য ও হিতাকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে কাজ করতে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর দরবারে প্রিয়। তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য ও সফলতার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর তাদের জন্যই এই পার্থিব জীবন অসীম নেয়ামতের আলামত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (سورة النور)

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদেরকে ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। (তাদের অবস্থা এমন হবে যে,) তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোনো শরিক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ তবে তারা তো সত্যত্যাগী।' [সূরা আন-নূর : আয়াত ৫৫]

ولقدْ كتبْنا في الزّبور منْ بعْد الذّكْر أنّ الْأرْض يرثُها عبادي الصّالحُون (سورة الأنبياء)

'আমি উপদেশের[৭০] পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।' [সুরা আল-আম্বিয়া : আয়াত ১০৫]

এ-আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যে, শাসন-ক্ষমতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি উত্তরাধিকারসূত্রে কেবল তাদেরই প্রাপ্য যারা একদিকে মুমিনও এবং অন্যদিকে আল্লাহ তাআলার আহকাম অনুযায়ী আমল করে সালেহিন ও নেককার ব্যক্তিদের স্তরভুক্তও হয়। অর্থাৎ যাদের সামগ্রিক জীবন এই দুটি গুণে গুণান্বিত, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য শাসন-ক্ষমতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার আল্লাহর পুরস্কার ও অনুগ্রহ।

আর যদি এসব গুণের অধিকারী না হয়, তাহলে শাসন-ক্ষমতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের ভিন্ন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। আল্লাহর হেকমত ও কল্যাণকামিতার প্রেক্ষিতে এটা পার্থিব সরঞ্জামের আকারে চলমান ছায়া। আর এ-ধরনের শাসন-ক্ষমতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এটা জরুরি নয় যে এর প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সম্মতি থাকবে।

---

৭০ ذكر অর্থ উপদেশ। আবার এর অর্থ লওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক)-ও হয়।—সহিহুল বুখারি, কিতাবু বাদইল খালক। زبور অর্থ লিখিত পুস্তক, এখানে আসমানি কিতাব। অনেকে এখানেও এর অর্থ করেছেন 'লওহে মাহফুজ'।—ইবনে জারির তাবারি, ইবনে কাসির, জালালাইন।